মঞ্চের বিবর্তন

নির্মল গুহ রায়

স্মরণ

ইতিহাস লেখা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইতিহাসের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে, কণ্টকাকীর্ণ—বন্ধুর পথের কথা বুঝে এবং সেই পথে চলার ব্যথা-বেদনা আক্ষেপ-আনন্দ, জয়পরাজয়, উচিত-অনুচিত ও পাওয়া না পাওয়ার সূত্র ধরেই এগিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, একান্ত কর্তব্য, সেখানে অনেক কিছু স্পষ্ট আবার অনেক কিছুই অস্পষ্ট, আলো-আঁধারের সেই পথ ধরেই এগোতে হয় সামনের উজ্জ্বল আলোর সন্ধানে। নইলে সঠিক পথের নিশানা পাওয়া অসম্ভব। সূত্র একটা থাকে বলেই অন্য বৃহৎ সূত্রের অনুসন্ধানেচ্ছাও থাকে। যেখানে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে যুক্তিতর্ক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়কে বিচার করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এইটাই সর্বকালের সিদ্ধান্ত। তাকে অস্বীকার করার অর্থ পায়ের তলার মাটিকে না জানা। সূত্র আছে বলেই তার বিকাশ ঘটে। মানুষ এই বিকাশ ঘটাতে পারে, পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারে। এই কারণেই সে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব। নইলে এতদিনে সে বিলীন হয়ে যেত অথবা সেই আদিম আরণ্যক জীবনেই আবদ্ধ থাকত। কিন্তু তা সে থাকেনি, আর সেইজন্যই আজকের পৃথিবী শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও চেতনায় এত পরিপূর্ণ।

আজ প্রয়োজন বর্তমান মঞ্চের গোড়া পত্তনের মূলে যে সব পথিকৃৎ ছিলেন তাঁদের স্মরণ করা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের কর্মকাণ্ডকে বোঝা ও আত্মস্থ করা ; নইলে মঞ্চের ধারা সম্যক উপলব্ধি হবে না। এঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে কারণ, এঁদের শুভযাত্রার পথ ধরেই আজকের বিশ্বে মঞ্চ সর্ববিষয়ে বিকশিত।

সূচনা

মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মিলিত রূপের প্রথম ভিতপ্রস্তর যেখানে স্থাপিত হয়েছিল সেখান থেকেই শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তার অতীতের অবস্থার সঙ্গে বর্তমানের কোনও সামঞ্জস্য নেই। তাই রেনেসাঁ থেকেই শুরু।

রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণ। চারিদিকে ভাঙা-গড়া শুরু। একদিক ঠিক করতে গিয়ে অপর দিক বেঠিক হয়ে যাচ্ছে। নানা তার সমস্যা, নানা তার সমাধান। শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার যুগলমিলন উৎসব চলছে। কিন্তু এগোচ্ছে, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই।

উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ পুরাতন ব্যবস্থার উপর বিজ্ঞানসম্মত নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার জয়জয়কার। ফলে সমস্ত কিছুর মূল্যবোধ পালটে যাচ্ছে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে, শিল্পে, সাহিত্যে, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও। ক্ষয়িষ্ণু মরচেপড়া ব্যবস্থার ভিত ভেঙে সমাজে পত্তন হচ্ছে আধুনিক চিন্তাধারার। আমূল পরিবর্তন এল সমাজচেতনা, কর্মপদ্ধতি, সমাজব্যবস্থায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের

সম্পর্কের নতুন বিন্যাস অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রম পরিবর্তন। অবশ্য এরজন্য বহুদূর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তৎকালীন গতানুগতিক উৎপাদন ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে। কিন্তু তাতে কী হবে, অগ্রগতির দ্বার কি কখনও জোর করে রুদ্ধ করা সম্ভব! নতুন গুণে চমকে-চটকে সর্ববিষয়ে তার আধিপত্য বিস্তার করবেই করবে। মঞ্চও পিছিয়ে ছিল না, সেও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল।

একটি কথা স্মরণীয় যে মধ্যযুগে সমস্ত খ্রিস্টান জগতে [সমগ্র ইউরোপে] অটুট ছিল এক অপূর্ব সামাজিক বাঁধন,—সে বাঁধন আধ্যাত্মিক। কারণ খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে মঞ্চকে মধ্যযুগে অবিরাম প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই হয়ত ইতালি-ফ্রান্স-ব্রিটেনের মঞ্চ-প্রকাশের মধ্যে বাহ্যিক অসামঞ্জস্যের মধ্যেও প্রচুর সামঞ্জস্য দেখা যায়। অবশ্য এই সামঞ্জস্যের মধ্যে অমিল হচ্ছে শুধু এইটুকু যে, যে যার নিজের দেশের সংস্কৃতি, জাতীয়সত্তা ও আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সবাই প্রায় এক। অর্থাৎ উদ্দেশ্য একই লক্ষ্যে পৌঁছনো। তাই দেখা যায় যদিও মঞ্চের নবজাগরণের উন্মেষ ইতালিতে কিন্তু এদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে আত্মিক যোগ থাকায় সমগ্র ইউরোপ তাতে প্রচণ্ড সাড়া দিয়েছে। সঙ্গে ছিল নতুনের নেশা। শিল্পে এই নবজাগরণের সূত্রপাত ইতালিতে। তাই সেখানে ফিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত।

প্রথমেই দুজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাঁরা রেনেসাঁ মঞ্চের প্রথম গোড়াপত্তন করেন। প্রথমত রাফেল [Raphaél] ১৫১৮তে একটি মঞ্চ তৈরি করেন। এই মঞ্চের কোনও নক্সা বা ছবি পাওয়া যায় না, তবে কিছু বইতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত সারলিও [Serlio] ১৫৪০ সালে একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন ভিসেন্স্ রাজপ্রাসাদে। এই মঞ্চের একটি নক্সা পাওয়া গেছে এবং মঞ্চটিকে রেনেসাঁ মঞ্চের গোড়াপত্তন বলা যায়। এটি অস্থায়ী মঞ্চ ছিল যারজন্য এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই রঙ্গালয়ের দর্শকগৃহের আসনগুলি অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত ছিল। সারিগুলি ছিল সংখ্যায় অনেক। প্রথম সারির মধ্যের আসন রাজার জন্য নির্দিষ্ট। রাজার ডাইনে ও বাঁয়ে রাজঅতিথি বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। রাজ আসনের পেছনে ছিল উপরের সারিতে যাবার সিঁড়ি। এই সারির সর্বশেষের উচ্চতা ছিল পাঁচ মিটার।

মঞ্চের অবস্থান দুটি অংশে বিভক্ত। প্রসেনিয়ম ও দৃশ্যবেদী। তৎকালীন প্রসেনিয়ম শব্দটি ব্যবহার করা হতো অভিনয়-বেদীকে বোঝাতে। অর্থাৎ যে স্থানটি অভিনেতারা অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করতেন। এই স্থানে দৃশ্যের অংশের কিছু থাকত না। পরিমাপের দিক দিয়ে দর্শকগৃহ ও অভিনয়বেদীর পরিমাণ সমান ছিল। দর্শকগৃহ হতে অভিনয়বেদীর উচ্চতা ১'৭০ মিটার। মঞ্চের অভিনয়বেদী ও দৃশ্যবেদীর গঠনগত পার্থক্য ছিল। অভিনয়বেদী ছিল সমান, দৃশ্যবেদী ছিল ঢালু। এই ঢালুর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এর সামনের দিকে নিচু এবং পেছনের দিক ছিল উঁচু। সারলিওর রীতি অনুসারে এই ঢালুর মাপ ছিল, পেছন থেকে সামনের দিকে আসতে প্রত্যেক

মিটারে আট থেকে দশ মিলিমিটার নিচু হবে। এর তাৎপর্য ছিল যে, পারস্পেকটিভ দৃশ্যসজ্জাকে সহায়তা করা। এরজন্য মঞ্চে একটি কথা প্রচলিত ছিল,—আপস্টেজ ও ডাউনস্টেজ। দৃশ্যবেদীতে অভিনয়ের প্রশ্ন না থাকায় এর গঠনরীতি অস্থায়ী ও দুর্বল ছিল। প্রয়োজনমতো এই কাঠামোকে খুলে রাখা যেত। যেহেতু কাঠের তৈরি, তাই স্থানান্তরিত করতে কোনও অসুবিধা হতো না। অভিনয়বেদী থেকে সামনের দিকে দৃশ্যবেদীর উচ্চতা ছিল এক ধাপ সিঁড়ি। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে এক ধাপ সিঁড়ির উচ্চতার মাপ হওয়া উচিত ছয় বা নয় ইঁঞ্চ। অর্থাৎ প্রায় পনেরো বা তেইশ সেন্টিমিটার। প্রশ্ন উঠতে পারে, অভিনেতারা কোথা দিয়ে যাওয়া-আসা করত? উত্তরে বলা যায় যে, অভিনয়বেদী ও দৃশ্যবেদীর মধ্যের স্থান দিয়ে এবং মঞ্চের ডান ও বাঁদিক থেকে।

সারলিও তৎকালীন মঞ্চসজ্জাকে তিন ভাগে ভাগ করে গেছেন—কমেডি, ট্রাজেডি ও স্যাটায়ার। কমেডি ও ট্রাজেডির দৃশ্যসজ্জার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত করেননি। শুধু বলেছেন যে কমেডিতে যে সব চরিত্রের সমাবেশ হতো, তাঁরা ছিলেন, বঞ্চিত মানুষ, বুর্জোয়া ও বণিক। ট্রাজেডি সম্পর্কে বলেছেন যে এখানকার পাত্রপাত্রী—রাজা, ডিউক ও প্রজা ইত্যাদি।

ট্রাজেডি এবং কমেডির দৃশ্যসজ্জা যে কী হবে তা তিনি বিশদ বিশ্লেষণ করে যাননি। তবে যদি তাঁর মঞ্চসজ্জা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করা যায় তবে অনুমান হয় যে তিনি যে বৃহৎ অট্টালিকার বহিরাংশের দুটি দৃশ্য অভিনয়বেদীর প্রায় সংলগ্ন দৃশ্যবেদীর উপর দুদিকে রাখতেন—সেটি হচ্ছে ট্রাজেডির জন্য। কমেডির জন্যে ছিল রাজপথ, অট্টালিকার দ্বারা বেষ্টিত। অবশ্য এ অনুমান যে মিথ্যা নয়, তা বোঝা যায় যখন দেখি তার মন্তব্যশিল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে সাবাতিনি দৃশ্য নির্মাণ করেন। সাবাতিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন সারলিওর এই মঞ্চরীতির কথা।

মঞ্চসজ্জার পারস্পেকটিভ সম্বন্ধে বলেছেন যে প্রথম অট্টালিকার যে উচ্চতা তা থেকে দশগুণ ছোট হবে সর্বশেষ অট্টালিকার উচ্চতা। ফলে সর্বশেষ গৃহটি একটি মানুষের উচ্চতা থেকে অনেক ছোট হতো। তাই মঞ্চের পেছন দিক থেকে কোনও অভিনেতার প্রবেশ-প্রস্থানের উপায় ছিল না।

মঞ্চের উভয় দিকে যে গৃহ নির্মাণ করা হতো তার পরিকল্পনা ছিল ইংরাজি সোজা এবং উল্টো 'এল'-এর মতন,—অর্থাৎ বাংলা মঞ্চে যাকে এল-ফ্লাট বলা হয়। এই 'এল'-ফ্লাট প্রথমে কাঠের তৈরি করে স্থায়ীভাবে মঞ্চে লাগান হতো; তারপর কাপড় বা ক্যানভাস লাগিয়ে তার উপর পেন্ট করা হতো। এই সব এল-ফ্লাটের পেছনে মোমবাতি লাগিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা যেত। সারলিও স্যাটায়ার মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে এই সব মঞ্চে থাকবে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, লতাগুল্ম, ঝর্ণা ও নদী ইত্যাদি। এগুলি অবশ্যই অঙ্কিতাকারে হবে।

সারলিও মঞ্চে আলোকসম্পাত সম্বন্ধে বলেছেন যে, মঞ্চে যদি কোনও রঙ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তবে তিনি আলোর সম্মুখে সেই রঙের ফিলটার দাঁড় করিয়ে দেন। মেঘ

গর্জনের জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বিদ্যুৎ ও আগুন দেখাতেও কার্পণ্য করেননি। সেই ১৫৪০ সালে তিনি যা করে গেছেন আমরা প্রায় সেইগুলিই অন্য কায়দায় আজও করে চলেছি।

সারলিওর পর আর একটি নাম আমাদের স্মরণের দরজায় ধাক্কা মারতে থাকে,—সে নামটি পালাডিও [Palladio], সে যুগের মঞ্চ নিয়ে যে কেউ আলোচনা করতে চান, তাঁকে এই নামটি স্মরণ করতেই হবে। পালাডিওর সময়কাল ১৫১৮-১৫৮০। ১৫৮০তে ভিসেন্স [Vicence]-এর অলিম্পিক অকাদেমি প্রকাশ করলেন এই নামটি। তাঁর যুগ সৃষ্টিকারী মঞ্চটি আজও বিদ্যমান। এ মঞ্চের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আজও দুনিয়ার মঞ্চ শিল্পীদের আন্দোলিত করে। হতবাক হয়ে সকলে চেয়ে থাকে এর পরিকল্পনা ও সুকুমার কারুকার্যের দিকে। এ মঞ্চ, মঞ্চজগতের জয়স্তম্ভ ও গর্ব। যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে হয়ত আজকের থিয়েটারের ভিতর-বাহিরের রূপকে সরলীকরণ করতে হয়েছে। কিন্তু ওই সময়ের পূর্তশিল্পী পারদর্শীদের কথা চিন্তা করলে বেশ পুলকিত হতে হয়। তাঁদের শিল্পরুচি কত সূক্ষ্ম, কত সুন্দর, কত পরিচ্ছন্ন। পালাডিও অবশ্য নিজেকে ভিট্রুভ-এর [Vitruve] ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই মঞ্চটির নাম—তিয়াত্রো অলিম্পিকো [Teatro Olimpico]।

মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ দুই এখানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রেক্ষাগৃহটি সুকুমার কারুকার্যময়। এই শিল্পমন্দিরের শৈল্পিক রূপ তাৎক্ষণিক দর্শকমনকে পরিব্যাপ্ত করে। তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুধু সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করেন। প্রেক্ষাগৃহের বসবার আসন চোদ্দটি সারিতে বিভক্ত। সর্বশেষ সারিকে বেষ্টন করে আছে ছত্রিশটি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভের চারিত্রিক গঠন একই প্রকার ; সূক্ষ্ম কারুকার্যে আবৃত। এই স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যভাগের দশটি স্তম্ভের পেছনেও বসবার ব্যবস্থা বিদ্যমান। দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশপথ উভয় দিকে আছে। এই চোদ্দটি সারি ছাড়াও একদম সামনে আরও একটি সারি সাজান হতো। এই সারির মধ্যমণি ছিলেন রাজা বাকি চেয়ার রাজার পার্শ্বচরদের।

এটি একটি অভিনব মঞ্চ। ইতিপূর্বে এই ধরনের মঞ্চের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এত মর্মস্পর্শী, এত আনন্দদায়ক, যা অননুকরণীয়! চেষ্টা করেও একে ভোলা যায় না! প্রথমেই চোখে পড়বে অভিনয় মঞ্চ। মঞ্চের উভয় দিকে প্রবেশ-প্রস্থানের পথ। এই অভিনয়বেদীটি প্রসেনিয়ম বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ। অভিনয়বেদী যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে দৃশ্যমঞ্চ। দৃশ্যমঞ্চের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রথমেই তিনটি পথ। ডানদিকের পথ কোনাকুনিভাবে মঞ্চ-গভীরে ডানদিকে গিয়েছে, এবং বাঁদিকের পথও ঠিক ওইভাবে বাঁদিকে মঞ্চ-গভীরে মিলিয়ে গেছে। এ ভিন্ন মঞ্চের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ পথ আছে। এই পথটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ মধ্যের পথটি অভিনয়বেদী হতে আরম্ভ হবার পর প্রায় দুই মিটার মঞ্চগভীরে গিয়ে আবার তিন ভাগে ভাগ হয়েছে,—ডাইনে, মধ্যে ও বাঁয়ে। প্রত্যেকটি পথ পারস্পেকটিভ

তিয়াত্রো অলিম্পিকো (এলিভেশন)

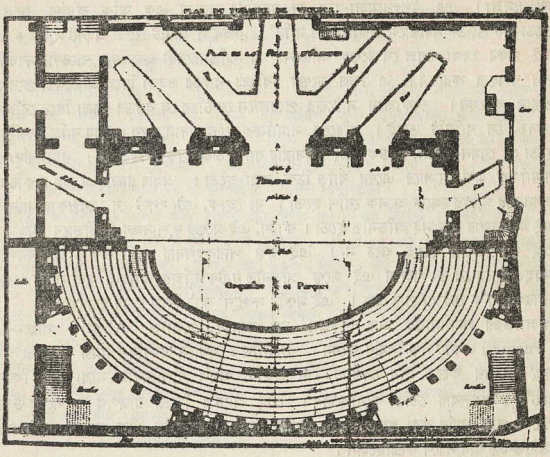

তিয়াত্রো অলিম্পিকো (গ্রাউণ্ড প্ল্যান)

রীতি অনুসারে মঞ্চ-গভীরের দিকে এগিয়ে গেছে। প্রত্যেকটি রাস্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, এর দুধারের গৃহগুলি নির্মিত হয়েছে তৎকালীন রাজপ্রাসাদ এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তিদের গৃহের অনুকরণে। গৃহ নির্মাণের রীতি ছিল মঞ্চ পায়স্পেকটিভকে অনুসরণ করা। এই মঞ্চের গঠনপ্রকৃতি ছিল ডাইমেনশনাল, অর্থাৎ বাস্তব গৃহের পুরোপুরি রূপ। দর্শক-গৃহ হতে এই দৃশ্যকে মনে হয় যেন কোনও বৃহৎ নগরীর রাজপথ, দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ অট্টালিকা। এইবার দর্শকগৃহ হতে সর্বপ্রথম যে অংশ চোখ জুড়িয়ে দেয় অর্থাৎ যে দেওয়াল বা বলা যায় মঞ্চনগরের প্রবেশদ্বার, সেই দেওয়াল হতে মঞ্চভিতরে তিনটি প্রধান পথের সূচনা। মধ্যের পথটি বৃহৎ এবং উপরে আর্চ আছে ; কিন্তু বাকি দুইদিকের প্রধান প্রবেশদ্বারের কোনও আর্চ নেই, আকারেও ছোট। পালাডিও বোধ হয় তাঁর শিল্পরুচির ও চিন্তার যা কিছু তাঁর সবদিকের কিছু কিছু প্রমাণ ও নিদর্শন এই মঞ্চ নির্মাণে রেখে গেছেন। এই দেওয়ালে উপরনিচু নিয়ে মোট দশটি কুলুঙ্গি, উপরের সারিতে ছয়টি এবং নিচের সারিতে চারটি। প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে একটি করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্তি স্থাপন করেন। এ ভিন্ন দেওয়ালে সর্বোপরি খোদিত আছে বিভিন্ন রসের কোনও এক বিশেষ মুহূর্তের অভিব্যক্তি। কার্নিশে নানা প্রকার সুকুমার কারুকার্য—সে এক

শিল্পমেলা। এই শিল্পমেলা-যুক্ত দেওয়ালটির সামনে এক ঝাঁক কাঠের স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মধ্যভাগে একটি করে মূর্তি। এইরূপ আটটি স্তম্ভে আটটি মূর্তি। এই প্রথম দেখা গেল যে মঞ্চের অভিনেতাগণ অভিনয়বেদী ছাড়াও দৃশ্যবেদীর সবকটি পথ ব্যবহার করছেন। এ ভিন্ন মঞ্চের বিভিন্ন বাড়ির দরজা দিয়ে অভিনেতা প্রবেশ-প্রস্থান করছেন। তৎকালীন নাটকের প্রয়োজনে যে চরিত্র যে বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসত, সে বাড়িটি তারই। চরিত্রের সামাজিক পদমর্যাদানুসারে এইসব বাড়ি নির্বাচিত হতো। যেমন—রাজা, ডিউক এবং ব্যবসায়ীর বাড়ি এক প্রকার ছিল না। রাজমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদানুসারে এদের বাড়ি ঠিক করা হতো। অর্থাৎ রাজার গৃহের চাকচিক্য ব্যবসায়ীর গৃহের থেকে অনেক বেশি হতো। যা হোক, এটা স্পষ্ট যে, সবপ্রকার নাটকই এই মঞ্চসজ্জার সামনেই অভিনীত হতো। কারণ, এই মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা স্থায়ীভাবে নির্মিত। তাই পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। এই মঞ্চ পরিকল্পনার মধ্যে একটি গূঢ় ব্যাপার নিহিত আছে যে তৎকালীন এই মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির কাহিনী যাই হোক, তার পারিপার্শ্বিক চেহারা প্রায় এক। এই মঞ্চটি সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল।

পালাডিওর সমসাময়িক আর একজন মঞ্চ-বিশারদ এলোতি [Alotti] পারমে-তে [Parme] একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন। পালাডিও যেখানে একাধিক রাস্তা ও তৎসংলগ্ন গৃহ নির্মাণ করেন, ইনি সেস্থলে মাত্র একটি, অর্থাৎ দৃশ্যবেদীর মধ্যে এক বিরাট আর্চযুক্ত রাজদ্বার তৈরি করেছিলেন। সেই আর্চের ভিতর রাজপথ ও পথের উভয় পার্শ্বে গৃহ নির্মাণ করা হয়। এসব কাঠের তৈরি। এলোতি গ্রীক-রোমান আর্কিটেক্ট ভিট্রুভ-এর অনুসরণে করেছিলেন।

এই সময় আর একজন মঞ্চকুশলী, নাম সিয়ারামণ্টি ১৬১৪ সালে *Delle Scene e theatri* নামে একটি বই লেখেন। ছাপানো হয় ১৬৭৫ সালে। এই বইতে তিনি মঞ্চ সজ্জার যে নির্দেশ দেন তাতে বোঝা যায় যে, মঞ্চের উভয় দিকে পারস্পেকটিভ রীতি মেনে দৃশ্যসজ্জা করা বাঞ্ছনীয়। ইনিই প্রথম নির্দেশ দেন যে, মঞ্চের শেষের দিকে অঙ্কিত পর্দা প্রয়োজনে তৈরি হবে এবং তা একাধিক হতে পারে ও দৃশ্যানুসারে তা পরিবর্তিত হবে। এই অঙ্কিত পর্দার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাট্যদুনিয়া খুঁজে পেল আর এক নতুন পথের সন্ধান। এ যেন আবদ্ধতা ভেঙে গতির বিচরণ শুরু!

সৃষ্টির নেশা চারিদিকে। এ নেশায় মেতেছে সকলে। এ যেন সৃষ্টির নেশার প্রতিযোগিতা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুক থেকে আলোর বর্তিকাকে ছিনিয়ে এনে প্রজ্জ্বলিত করা। চতুর্দিকে মুক্তির জয়গান। কত কুসুম, কত রতন, কত সুকুমার হাত আজ মঞ্চকে নবরূপে সাজাচ্ছে। মঞ্চ উদার দৃষ্টিতে সকলকে জানিয়েছে স্বাগত। কাউকে কখনও বাধা দেয়নি। কিন্তু আশ্চর্য! নানা রূপে নানাভাবে সেজেও তার রূপচর্চার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। তাই প্রতীক্ষা করতে লাগল তার মনের মানুষের জন্য, তার প্রিয়জনের জন্য। শেষে একদিন আধো আলো, আধো অন্ধকারে মঞ্চাকাশে দেখা গেল এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,—তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত

হল সমস্ত আকাশ। এলেন সাবাতিনি, নতুন অকৃপণ কল্পনা নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে। তিনি এসে নতুন কল্পনা ও আধুনিক কর্মপদ্ধতির দ্বারা মঞ্চকে নতুন রূপ দিলেন এবং নতুনভাবে সাজালেন।

নিকোলা সাবাতিনি [Nicola Sabbattini]। সাবাতিনি, একটি নাম নয়, একটি দেশের নয়, একটি কালের নয়, তিনি এক আদর্শ, এক মহান সূচনা, এক আধুনিক বিজ্ঞান, এক যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, জয়গান। তিনি স্থবির মঞ্চকে করে তুললেন চঞ্চল, বহুমুখী, পরিবর্তনশীল, গতিময়। অচলায়তনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের আলো-বাতাসের প্লাবন বইয়ে দিলেন সাবাতিনি।

সাবাতিনি মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চের কলা-কৌশলের উপর একটি বই লেখেন। বইটির নাম—"প্রাতিকা দি ফেব্রিকার সিন এ মেশিন নে তিয়েত্রি [*Pratica di fabricar scene e machine ne' teatri*]।" মুদ্রিত হয় ১৬৩৭ সালে। এই বইতে তিনি মঞ্চের রীতি নীতি ও যান্ত্রিক কৌশল সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা বলে গেছেন। দ্বিতীয়ত এই বইতে তৎকালীন মঞ্চ গঠনরীতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তিনি।

মঞ্চবেদী গঠনে তিনি সারলিও-কে অনুসরণ করেছেন। তবে সারলিও মঞ্চস্তরকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন, সাবাতিনি তা করেননি। তিনি মঞ্চের স্তর একই রেখে পেছন দিক উঁচু রেখে সামনের দিকে ক্রমশ ঢালু করে এনেছেন। অর্থাৎ মঞ্চের পেছন দিক আপস্টেজ এবং সামনের দিক ডাউনস্টেজ।

দর্শকগৃহ সম্পর্কেও তিনি সারলিওকে অনুসরণ করেন। প্রথমে রাজা বা প্রিন্স-এর আসন দর্শকগৃহের প্রথম সারির মধ্যস্থলে স্থাপিত করে পরে অন্যান্যদের আসনশ্রেণী নির্দিষ্ট করেন।

দৃশ্য পরিকল্পনার রীতি হিসাবে বলেছেন যে মঞ্চের সম্মুখ হতে পরপর তিনটি গৃহ পারস্পেকটিভ রীতি অনুসারে নির্মিত হবে এবং সর্বশেষে একটি পর্দায় আঁকা থাকবে বৃহৎ রাজকীয় আর্চ [Gateway]। উভয় দিকে তিনটি বাড়ির কাঠামো আলাদা আলাদা তৈরি হবে এবং প্রত্যেক দিকের বাড়িগুলির মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যাতে অভিনেতা যাতায়াত করতে পারে। দৃশ্যটি যখন পূর্ণরূপ নেবে তখন যেন মনে হয় কোনও নগরীর সুবৃহৎ রাজপথ।

দৃশ্য নির্মাণ সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রথমে বাড়িগুলির কাঠামো মঞ্চবেদীতে তৈরি হবে তারপর তাতে কাপড় বা ক্যানভাস লাগিয়ে অঙ্কিত করতে হবে। দরজা-জানালা দর্শকগৃহের দিকে থাকলে তাকে আসল দরজা-জানালার বাস্তব রূপ দিতে হবে।

'সিয়েল' [ciels] অর্থাৎ আমরা যাকে 'স্কাই' বলি। এই স্কাইগুলি মঞ্চে নির্মিত প্রত্যেক গৃহের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এদের গঠন প্রকৃতি আর্চের মতো।

এগুলিকে উপর থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে দড়ি ও কপির সাহায্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কাইয়ের মধ্যবর্তী স্থানের মধ্য দিয়ে মেঘ নামিয়ে দেওয়া হতো। সাবাতিনি এই

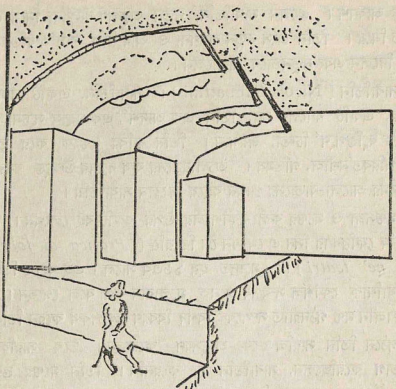

[ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনটি বক্স-সেটের উপর তিনটি আর্চের মতো স্কাই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উভয় স্কাই-এর মধ্যে মেঘের কাট-আউট ঝুলছে। স্কাই-এর উপরে পর্দায় তুষারপাতের দৃশ্য আঁকা হয়েছে।]

স্কাইয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মঞ্চের গৃহগুলি যে আকাশের নিচে বিরাজ করছে, এ তারই রূপক প্রকাশ।

সাবাতিনির সময় থেকে প্রসেনিয়ম ফ্রেম একটি স্পষ্ট ও স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। সাবাতিনির পূর্বে এই প্রসেনিয়মকে মঞ্চসজ্জাকরগণ কাঠামোকে পরিবর্তন করে নতুন দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুনভাবে তৈরি করে নিতেন এবং নতুন রঙে অঙ্কিত করতেন।

সাবাতিনি বিভিন্ন প্রকার দৃশ্যের উল্লেখ করে গেছেন এবং এই সকল দৃশ্যের অবস্থান কোথায় কী প্রকার হবে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। পূর্বে যে সব দৃশ্যের চরিত্র ও গঠনপ্রকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ক্রমপরিবর্তন শুরু: অর্থাৎ স্থায়ী দৃশ্যের পরিবর্তে অস্থায়ী দৃশ্যের অবতারণা, যাকে প্রয়োজন মতো স্থানান্তরিত করা সম্ভব। এই প্রথম দেখা গেল দৃশ্য পরিবর্তনের তাগিদ। এই তাগিদ মঞ্চদুনিয়ার সামগ্রিক চিন্তায় বিস্ফোরকের মতো কাজ করল। নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পনির্দেশক ও দর্শক সকলেই পুলকিত। ব্যাপারটি কী করে হবে—এই চিন্তায় মশগুল। শুরু হল গবেষণা, আলোচনা, বাকযুদ্ধ, তুমুল আলোড়ন!—তবুও সমস্যার সমাধান নেই। সকলের দৃষ্টি তীরমুখী ওই সাবাতিনির দিকে! কী হয়, কী করেন! শেষে সকলের চিন্তা ও গবেষণার অবসান ঘটিয়ে তিনি মঞ্চদৃশ্যের পরিবর্তন করলেন। দর্শকদের

বিস্ময়ের আবেশ জড়ানো চোখের সে কী চাহনি !—যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না ! শুধু উল্লাস-উচ্ছ্বাস আর পুনঃপুনঃ হাততালি···।

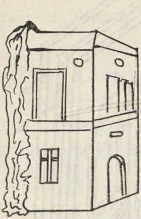

প্রথম অবস্থা।

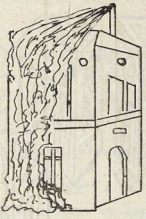

দ্বিতীয় অবস্থা।

তৃতীয় অবস্থায় পর্দা বক্স সেটকে ঢেকে দিয়েছে।

অর্থাৎ নাটকে আছে প্রথম দৃশ্যে একটি নগরপথ, যার উভয় দিকে তিনটি করে গৃহ। দ্বিতীয় দৃশ্য,—একটি বন। তিনি এক অদ্ভুত কৌশলে সমাধান করলেন পটপরিবর্তনের কাজ। একটি লাঠির মাথায় এই বন-অঙ্কিত পর্দার একদিক বাঁধা থাকত এবং অপর দিক বাঁধা থাকত এই এলফ্লাটব্বয়ের প্রথম ফ্লাটে। এখন সময়মতো ওই লাঠিকে ঘুরিয়ে সমস্ত পর্দাকে বিছিয়ে দেওয়া হতো পুরো কাঠামোর উপর। পুনরায় প্রয়োজনে ওই লাঠির সাহায্যেই সরিয়ে ফেলা হতো পর্দাকে। পারস্পেকটিভ রীতিতে বাড়িগুলি যে হেতু সাজানো, সেই হেতু অপসারিত পর্দা দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে থাকত।

মানুষ যখন নতুনের নেশায় মেতে ওঠে, তখন তার ব্যাপ্তি ও বিকাশের শেষ থাকে না। চঞ্চল মনে সদাই খুঁজতে থাকে আরও—আরও কিছু। এই অনুসন্ধান যেন সীমাহীন অনন্ত, কিছু পেলেও থামতে চায় না,—চাই—আরও চাই। সাবাতিনির এই চাইবার ও পাবার শেষ নেই। নিত্যনতুন দৃশ্য-পরিকল্পনার চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি গ্রীক-রোমান আর্কিটেক্ট ভিট্রুভ-এর পেরিঅ্যাক্ট [Periacte] বা প্রিজম-ট্রায়াঙ্গুলার মঞ্চসজ্জার প্রচলন করেন। এ এক নবতর মঞ্চরূপ। এর বিকাশ ও প্রসার ততো না হলেও এর মধ্যে এক মজার ব্যাপার বিদ্যমান। আজকে একে নবপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে আনলে অতিরিক্ত দৃশ্যের অবতারণার ক্ষেত্রে অনেক সরলীকরণ করে নাটক উপস্থাপনা করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে যদি এই পেরিঅ্যাক্ট এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাতে দৃশ্যসম্ভার হয়ত আরও গুরুত্ব পেতে পারে।

ব্যাপারটা ছবিতে স্পষ্ট। দুটি করে পেরিঅ্যাক্ট মঞ্চের উভয় দিকে বসানো হতো। প্রয়োজন মতো দর্শকের সামনেই বা অগোচরে এগুলিকে ঘুরিয়ে দৃশ্য পরিবর্তনের কাজ সমাপন করা হতো। এই পেরিঅ্যাক্টের তিন দিকে তিন প্রকার দৃশ্য অঙ্কিত থাকত।

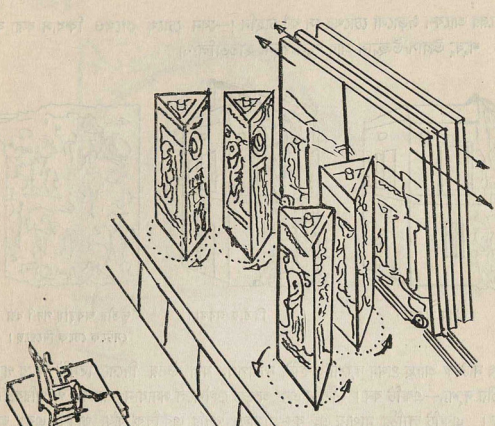

পেরিঅ্যাক্ট

প্রত্যেকটি পেরিঅ্যাক্ট একটি পিভটের উপর লাগানো হয়, যাতে অতি সহজে একে ঘোরানো যায়। পেরিঅ্যাক্টগুলির পেছনে থাকত টানা-সিন ['টানা-সিন' নাম দেবার কারণ, একে দুই দিক থেকে টেনে আনা হতো]। এইরূপ প্রত্যেকটি টানা-সিন দুই অংশে বিভক্ত ছিল একে সহজভাবে ব্যবহার করবার জন্য মঞ্চে কাঠের লাইন বসানো হতো এবং এইসব সিনের ফ্রেমে কাঠের চাকা লাগানো থাকত। যাতে উভয় দিক থেকে ঠেলে সিনকে অনায়াসে মিলিয়ে দেওয়া যায়। যেহেতু পেরিঅ্যাক্টের তিনটি দিক ছিল, তাই টানা-সিনের সংখ্যাও তিন ছিল। পেরিঅ্যাক্টের প্রত্যেক দিকের দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পারস্পেকটিভ রীতি অনুযায়ী ঠেলা-সিনেও দৃশ্য অঙ্কিত হতো। যার ফলে দৃশ্যের পৃথক পৃথক চরিত্র পরিস্ফুটিত হতো।

সাবাতিনি শুধু মঞ্চ বিশারদ ছিলেন না, মঞ্চে নানা প্রকার কলাকৌশলও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এইসব কলাকৌশল বর্তমানে দেখিয়েও বেশ বাহবা পাওয়া যায়। এরমধ্যে হঠাৎ বাড়ির কিছু অংশ ভেঙে পড়া অর্থাৎ বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি ফ্রেমে কব্জা ব্যবহার করতেন, ভ্যানিশিং ট্র্যাপ্ তৈরি করে অকস্মাৎ আবির্ভাব বা পলায়ন। আকাশ পথে

দেবদেবীর আগমন, পরীর দল উড়ে চলেছে, কখন আবার নদী বয়ে চলেছে কলকল রবে, বর্ষায় সে কী মেঘ গর্জন, ক্যাস্‌কেড থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বাঁকা চোখে ইত্যাদি !

আগুনের খেলা দেখাতে সাবাতিনি যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তা ভাবলে আজও শিহরণ ও বিস্ময় হয়। যে বাড়িতে বা যেখানে আগুন দেখাবার দরকার, সেই অংশে কাপড় লাগিয়ে প্রয়োজনীয় রঙের কাজ করা হতো। এরই আশেপাশের অংশ জলে ভিজিয়ে দেওয়ার পর আগুনের অংশ স্পিরিটে ভিজিয়ে রাখা হতো। পরে সময়মতো সেখানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হাততালি ও বাহবা দুই-ই মিলত।

আলোক সম্পাতের ক্ষেত্রেও সাবাতিনির অবদান অকল্পনীয়। অভিনেতা অভিনয় করে চলেছেন। প্রথম দৃশ্য শেষ হবার পর দ্বিতীয় দৃশ্য এল। দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বনভূমি, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, চারিদিকে ঝড়ের তাণ্ডব, দেখতে দেখতে দর্শকদের হাততালি, চারিদিকে বাহবা-বাহবা রব ! হারিয়ে গেল নাটক, হারিয়ে গেল অভিনেতা, শুধু প্রশ্ন, কী করে হল ? কেমন করে হল ? নাটকের ট্রাজেডি গেল ঘুচে, মহান হলেন সাবাতিনি, যিনি এগুলি সৃষ্টি করলেন। এখন দেখা যাক কী করে এইসব করলেন।

নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে সাবাতিনি মঞ্চে যে সব গৃহ তৈরি করেছিলেন সেগুলির গঠন প্রকৃতি ছিল—এলফ্লাট। সেই এলফ্লাটের উপর কীভাবে বন-অঙ্কিত পর্দা ছাঁড়িয়ে দিয়ে বনের দৃশ্য তৈরি করেছিলেন। এই এলফ্লাটের যে দিকটি মঞ্চগভীরে এগিয়ে গেছে, সেই ফ্লাটের পেছনে তৈরি করেছিলেন নোমের এবং তেলের বাতির সারি, যার পরবর্তী নাম হয়েছিল স্ট্রিপলাইট। এই আলোর সারি ফ্লাটের গায়ে দাঁড় করানো থাকত। প্রত্যেক গৃহের ফ্লাটের শেষে এইরূপ আলোর সারি তৈরি করা হতো। এ ভিন্ন মঞ্চসম্মুখে এবং প্রসেনিয়মের উভয় দিকে এই সব বাতির সারি সাজানো থাকত। এই সব আলো ছাড়াও মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক আলোর ব্যবস্থা ছিল। আলো-আঁধার নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি একপ্রকার ওপেক-ঢাকনা নির্মাণ করেন, যার দ্বারা তিনি আলোকে বেশি কম করতে পারতেন। এ ছাড়া সম্পূর্ণ অন্ধকার করবারও উপায় ছিল। ল্যাম্পশেড-এর দ্বারা তিনি আলোকে কেন্দ্রীভূত করতেন বা আলো ঢেকে দিতেন। রিফ্লেক্টর ব্যবহারের কথাও তিনি উল্লেখ করে গেছেন। লোহার পাতকে পিটিয়ে পাতলা করে তার একদিক কেমিকেল বা গ্যালভানাইজ করে রিফ্লেক্টর তৈরি করতেন যাতে সেই দিক উজ্জ্বল ঝকঝক করে ও তার সাহায্যে আলো প্রতিফলিত হয়। যখন বিদ্যুৎ দেখাবার দরকার হতো, তখন সমস্ত আলোকে ঢেকে দিয়ে এক সারি রিফ্লেক্টর যুক্ত আলো হঠাৎ খুলেই বন্ধ করে দিতেন। ফলে এক ঝলক আলো হঠাৎ চমকেই আবার মিলিয়ে যেত, যা সহজেই বিদ্যুৎ বলে মনে হতো। সোর্স অব লাইট বলতে আজ যা করা হয় তা কিন্তু সাবাতিনির দান।

সর্বশেষে বলা যায়, বিশ্বমঞ্চে উড়ুক উদ্ধত জয়পতাকা আর তাতে লেখা থাক : নিকোলা সাবাতিনি।

গণশিল্প

শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন, সহজাত। সাংস্কৃতিক মানুষের কোনও জাত নেই, নেই ধর্ম বা দেশকাল। যুগে যুগে মানুষ শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শিল্পকে আয়ত্ত করতে, আত্মস্থ করতে সে ছুটে বেড়িয়েছে দেশ দেশান্তরে। এ প্রচেষ্টার, এ আকাঙ্ক্ষার বিরাম নেই—সে অবিরাম গতিশীল। হয়ত শিল্প সংস্কৃতিকে আঁকাবাঁকা পথে চলতে হয়েছে, আবার কখনও হয়ত আবদ্ধতার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তবুও নানান রঙে, নানান ঢঙে নিয়ত তার প্রকাশ হয়েছে ; কখনও স্থবির হয়ে পড়েনি, তার অগ্রগতি ও সচলতা ব্যাহত হয়নি। ফলে ফুলে সে সতত বিকশিত, আদান-প্রদানে অকৃপণ। তাই তো মিশর, চীন, ভারত, গ্রীক, রোম, ইতালি ফ্রান্স, জার্মানির শিল্প-সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার ও একাত্ম হয়ে বিশ্বে বিচরণ করছে। এই যাত্রা অন্তহীন ; যতদিন বিশ্বের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এর গতিশীলতা আরও ব্যাপক ও আরও ঘনিষ্ঠতম হবে।

আরণ্যজীবনেও মানুষ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিল। রাতে সমবেত হয়ে নাচ-গানের মধ্যে তাদের সাংস্কৃতিক মনের পিপাসা মেটাত। সেখানে কোনও ভেদ ছিল না, ছিল না কোনও ঈর্ষা-বিদ্বেষ। মুক্ত মনের বিকাশ ঘটত সেখানে। তখন শিল্প দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল না। শিল্পের পরিবর্তন যেটা হয় তা আঙ্গিকের এবং বিষয়বস্তুর কিন্তু মনের চাহিদার আকর্ষণ, শিল্পের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার মধ্যে কোনও চিড় ধরেনি,—সে সমভাবেই প্রবাহিত। সেইটেই চিরন্তন।

তারপর একদিন আগ্রাসী আক্রমণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেই আরণ্যক জীবন, বিভক্ত হয়ে গেল তার সামগ্রিক রূপ। সামাজিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হল। সাম্যের মধ্যে অসাম্য অনুপ্রবেশ করল। ছিনিয়ে নিল তাদের জীবন থেকে সহজ আনন্দমুখর দিন-গুলি। শিল্প-সংস্কৃতি সামাজিক ও লৌকিক আসর ছেড়ে স্থান পেল রাজদ্বারে। সহজ স্বাভাবিক শিল্প-সংস্কৃতি সাময়িকভাবে গণআসর ছেড়ে স্থান পেল রাজপ্রাসাদে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্প জন্মলাভ করল, তা শুধু রাজানুগ্রহ, রাজসন্তুষ্টির জন্য রাজাকে কেন্দ্র করে প্রসার লাভ করল। ফলে শিল্পসত্তা পরিবর্তিত হল রাজকীয় অহঙ্কারে ও অলঙ্কারে। সেই সঙ্গে রাজনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও ধর্ম-প্রতিনিধি বোঝা রূপে শিল্পের ঘাড়ে চাপল। শিল্পের নান্দনিক দিক বিসর্জিত হল রাজা ও ধর্মীয় পুরুষদের হস্তক্ষেপে। তাদের অনুকম্পায় যে শিল্প গড়ে উঠল তার আকর্ষণ ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মধ্যে প্রবহমান হতে লাগল। যদিও রঙে ও ঢঙে বেশ চাকচিক্যময় কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। এই সব সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও আত্মিক সম্পর্ক ছিল না।

শিল্পের সর্ব শাখায় যখন এইরূপ বিচিত্র অবস্থা, মঞ্চেও এর প্রতিফলন স্পষ্ট। জনগণের সৃষ্ট উৎপাদিত সম্পদ ছিনিয়ে এনে রাজন্যবর্গ তৈরি করেছিলেন নিজ-প্রাসাদে স্ফূর্তির আসর। জনগণের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তারা ছিল এই শিল্পোদ্যোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তারা শুনত এই সব শিল্পের নানান রসাল কাহিনী। ফলে শুরু হতো তাদের মনে প্রতিক্রিয়া,—জেগে উঠত শিল্পসৃষ্টির সুপ্ত কামনা। তাদের মধ্যে দেখা দিত নানা উদ্যোগ ও জল্পনা-কল্পনা।

নবজাগরণের সঙ্গে ইতালিতে মঞ্চশিল্পের অগ্রগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। তৎকালীন ইতালি আজকের ইতালির মতো একই রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। তখনকার ইতালি ছিল বহু অংশে খণ্ডিত। এক-এক অংশের রাজা বা সামন্ত ছিলেন এক-একজন। এদের মধ্যে ছিল রাজনৈতিক বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব। কিন্তু একটি বিষয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে ছিল মিল, সে মিল ছিল মঞ্চশিল্পের উন্নতির আন্তরিক প্রতিযোগিতায়। এই শিল্পের বিচারক রাজন্যবর্গ, এই শিল্পের উপস্থাপনায়ও ছিল রাজন্যবর্গ। সাধারণ মানুষ এইসব মঞ্চশিল্প থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ এখানে ছিল না। কারণ, এই শিল্পের প্রচার ও প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় রাজপ্রাসাদের দর্শকদের মধ্যে।

যত প্রাচীরাবদ্ধ নাট্যোৎসবের খবর বাইরে আসতে লাগল, ততোই জনমানসের উপর তার প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হতে থাকল। মানুষের মন ক্রমে চঞ্চল ও অস্থির হয়ে পড়ল। মানুষের শিল্পের প্রতি আকর্ষণ ও কিছু করবার তাগিদ, তাদের বিরামবিহীন মানসিক যন্ত্রণায় বিড়ম্বিত করত। গণশিল্পীর দল ভেবে পাচ্ছেনা কোন পথে এগোলে এই নতুন ধারার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মতো অর্থ ও সঙ্গীত তাদের নেই, আবার ভাবনা-চিন্তার সূত্রও খুঁজে পাচ্ছে না অথচ আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। মনের মধ্যে শুধু আলোড়ন—কিছু করতে হবে। এদিকে সূর্যোদয় থেকে অন্ত অবিরাম পরিশ্রমের মধ্যে সময় কোথায় কিছু ভাবনা চিন্তার! কিন্তু শিল্পীর মন বড় অবাধ্য, এ সংসারের দুঃখ-ব্যথা সমস্যার কথা ততো ভাবে না, যত ভাবে ওই সঙ্গীত-সুর-নৃত্য-নাট্য নিয়ে!

সেদিন শহর ভেনিসে, রৌদ্রদীপ্ত দিন প্রায় সমাপ্ত। বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভা রাঙিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি ও মানুষকে। এই সময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আর বৃষ্টি ঝরা দিনের কথা মানুষ ভাবতেও পারে না! এই আলোয় আলো ভরা দিনে মানুষের প্রাণচাঞ্চল্য উপচে পড়ছে। বিহঙ্গের কোলাহল, যুবক-যুবতীর উচ্ছ্বাস, খুশি ভরা মানুষের আনাগোনা সব মিলিয়ে ভেনিস যেন উৎসবে মেতেছে! আজ যেন সবাই ক্লান্তিহীন স্বতস্ফূর্ত! কোনও দুঃখ নেই, বেদনা নেই, আছে শুধু প্রাণপ্রাচুর্য, যৌবনের উদ্দামতা কিশোরের চাপল্য, জীবনের জয়গান।

সিডনে বোকজ্যা, রাজবাড়ির ফিটন চালক। কী কারণে আজ সকাল-সকাল ছুটি পেয়েছে। দিনের মেজাজ আর ছুটির মেজাজে সে আত্মহারা। স্ফূর্তির পেয়ালা হাতে

নিয়ে প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে,—এসো আমার পেয়ালায় একবার চুম্বন করে যাও। মাঝে মধ্যে পল্লীগীতের সুর দু-চার ছত্র গেয়ে চলেছে। স্ফূর্তিবাজ লোক বলে সে পরিচিত। কেউ কেউ খুশি হয়ে তার পেয়ালা পরশ করে যাচ্ছে। আত্মভোলা সিডনে অজান্তে কাছের একটি উদ্যানে ঢুকে পড়েছে, সে টেরই পায়নি। হঠাৎ দেখতে পেল তার এক চাষী বন্ধু একাকী নীরবে বসে রয়েছে। সে ধীরপদে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বন্ধুটি ভাবাবেগে এত বিভোর যে সে সিডনের আগমন বুঝতেই পারেনি। সিডনে কিছু সময় বিস্ময়ে তার প্রতি তাকিয়ে থেকে শেষে ডাক দিল,—রোমিও? ডাক শুনে রোমিও চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে সিডনেকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। চকিতে গাছের পাখি দিনের শেষের গান গেয়ে উঠল। উদ্যানের মধ্যে একটি ছোট জলাশয়ে দুটি শ্বেত মরাল হঠাৎ ডেকে উঠে যেন এদের মিলনের মাধুর্যকে আরও কাব্যময় করে তুলল। দূরে এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পরস্পরের হাত বেষ্টন করে বোধ হয় ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি মন্থনে ব্যস্ত। একটি ঝোপের আড়ালে অর্ধ-এলায়িত দেহে পরস্পরকে বেষ্টন করে আছে এক যুবক-যুবতী। এ যেন এক মিলনোৎসব!

এই সময় রাস্তা দিয়ে সুন্দরী রোজালিন একটি সুর গাইতে গাইতে কোন অজানার পথে চলেছে। সে দুনিয়ায় বড় একলা! একদিন তার সব ছিল কিন্তু আজ সব শূন্য। সে সুন্দরী ও সুগায়িকা। শোনা যায় কোনও এক রাজপুরুষ তাকে প্রলোভিত করে তার নারীজীবনের সম্পদকে অসম্মানিত করে আজ রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। ফলে রোজালিন কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর গান করে। তার ভবঘুরে জীবনে কোনও নির্দিষ্ট নিবাস নেই। লোকে তাকে আদর করে—'সূর্যমুখী' বলে ডাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার হদিশ পাওয়া যায়, কিন্তু রাতের অন্ধকারে সে যে কোথায় হারিয়ে যায় কেউ জানে না! রোমিও তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকে,—

রোমিও। ও সূর্যমুখী, কোথায় যাও? এদিকে এসো না?

রোজা। কেন গো গোঁসাই, ডাকছ কেন?

রোমিও। বলি যাচ্ছ কোথায়?

রোজা। নাগরের খোঁজে…। তোমরা এখানে কী করছ?

সিডনে। ভাবছি…।

রোজা। কী ভাবছ?

রোমিও। দেখছ না, রাজবাড়িতে কেমন হৈ চৈ হচ্ছে! আর আমাদের সাংস্কৃতিক মন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে!

রোজা। হৈ চৈ করা ওদের ধর্ম। দু দিন আমোদ-প্রমোদের পর যখন ভাল না লাগে, তখন উচ্ছিষ্ট ও ছিবড়ে করে ফেলে দেয়।

সিডনে। আমরা তো আর রাজাগোজা নই যে নিছক হৈ চৈ করব! আমরা বলব জীবনের কথা,—যে জীবনের বাল্যকাল, কিশোর-যৌবন-বার্ধক্য নেই, আছে হাহাকারের হৈ চৈ। দুঃখ বেদনার মধ্যে মানুষের মুখে হাসি ফোটাব।

রোজা। বাঃ, বুকনিতো বেশ শিখেছ! কর কী?

সিডনে। রাজার ফিটন চালাই।

রোজা। তুমি?

রোমিও। চাষ করি। কাজ না থাকলে রাজপ্রাসাদে রাজমিস্ত্রীর জোগারে হই।

রোজা। দুজনেই তাহলে ওদের সম্পদ বাড়াবার কাজে লিপ্ত?

রোমিও। রাজা-প্রজা উভয়েই যে পরস্পরের পরিপূরক। একে অপরকে আশ্রয় করে চলে।

রোজা। বাঃ, কী চমৎকার মিলন! [রোজা গান ধরে] 'রাই মিলিল গো শ্যাম সনে···।'

সিডনে। ভুল বুঝছ, তেলে-জলে কি মিল হয়?

রোজা। ঠিক বুঝেছ। ওদের জলসাঘরের ও সম্পদ বাড়াবার পুঁজিতো আমরা। তাই ওদের আহ্লাদে আমাদের আহ্লাদিত হবার কোনও কারণ নেই···।

সিডনে। তাই বলে আমাদের শিল্পীমনের পিপাসা মেটাব না?

রোজা। নিশ্চয়ই মেটাবে।

সিডনে। কীভাবে?

রোজা। কেন! সেই গ্রীক-রোমান যুগ থেকে যেভাবে হাটে-মাঠে-ঘাটে মানুষকে খুশি করেছে, মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছে, সেইভাবে···।

রোমিও। সেই মাইম আর প্যান্টোমাইম! বড় পুরনো,—মানুষ নতুন কিছু চাইছে, বিশেষ করে রাজবাড়ির এই কর্মকাণ্ডের পর···।

রোজা। [গান ধরে] 'প্রমোদে ঢালিয়া দিও—না মন'। ওদের অনুকরণ করতে গেলে তুমি হাস্যাস্পদ হবে। না পারবে ওদের মতো করতে, না পারবে নিজের পথ ঠিক রাখতে।

সিডনে। তাহলে—?

রোজা। কেন!···তোমাদের মাইমের মধ্যে কথা ও কাহিনী, নৃত্য ও সঙ্গীত ঢুকিয়ে দাও, দেখবে কী কাণ্ডই না হবে।

রোমিও। কিন্তু ওদের ওই চাকচিক্যের পাশে আমাদের এ শিল্প বড় ম্রিয়মাণ দেখাবে···

রোজা। আহা, করেই দেখনা···, এত নিরাশ হচ্ছ কেন···

সিডনে। বলছ? ওদের আঙ্গিকের কিছুই নেব না?

রোজা। না নিলেই ভাল। দেখবে তোমাদের নিজস্ব আঙ্গিক জন্ম নেবে। আর যদি নিতেই হয় তবে বুঝে নিজের মতো করে নেবে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

রোমিও। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে?

রোজা। নিশ্চয়ই।

সিডনে। তোমার আবার কখন দেখা পাব ?

রোজা। সূর্য উঠলে··· । এখন যাই ?

রোমিও। কোথায় যাবে ?

রোজা। কেন! খবর দিতে, সকলকে জানান দিতে, নতুন দিনের জন্মের খবর—, [রোজা গান ধরে]—'এখন মরা গাঙে বান ডেকেছে, জয়মা বলে ভাসাও তরী—' [প্রস্থান করে]

চলেছে, ছুটে চলেছে সূর্যমুখী। পায়ে তার নূপুর, মুখে তার গান,—'জাগো জাগো নগরবাসী, নিশি অবসান, পূবাকাশে রঙ ধরেছে, হও সবে আগুয়ান।' চারিদিকে উত্তেজনায় সাড়া পড়ে গেল।—এ কী নূপুরের তাল, গানের মূর্ছনা, মনের এ কী উথাল-পাথাল অবস্থা !

১৫১৮ অথবা ১৫১৯ থেকে এই নূপুরের ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেলেও সে শব্দ খুবই ক্ষীণ ছিল। পূর্ণ বিকাশ শুরু হয় ১৬৫০ থেকে।

রোমান যুগ থেকে মাইম ও প্যান্টোমাইম-এর মাধ্যমে যে শিল্প অর্থাৎ মঞ্চশিল্প প্রদর্শিত হয়ে আসছিল সেই ধারারই কিছু রূপ পরিবর্তন ঘটিয়ে জন্ম নিল 'কমেডি-ডেল-আর্টে'। এই মাইম ও প্যান্টোমাইম তৎকালীন সমগ্র ইউরোপের সাধারণ মানুষের শিল্পক্ষুধা মেটাত। এ শিল্প ছিল লৌকিক শিল্প, তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর ছিল গভীর আত্মীয়তা। প্রকাশভঙ্গি সহজ-সরল, সাবলীল। প্রধান উপজীব্য হাস্যরস। কিন্তু ইতালিতে এই শিল্প যখন নতুন রূপ গ্রহণ করল তখন এর সঙ্গে সংমিশ্রিত হল সংলাপ-সঙ্গীত-নৃত্য-দৃশ্যসজ্জা। যা পূর্বে প্রচলিত মাইম ও প্যান্টোমাইমে আদৌ ছিল না। এই নতুনতর শিল্পের সর্বজনীন আঙ্গিক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাঠে-ময়দানে উড়তে শুরু করল এই শিল্পের জয়পতাকা। চিরকালের পৃষ্ঠপোষক মঞ্চশিল্পের দরদী দর্শক, সাধারণ মানুষ আনন্দে আটখানা হয়ে ফেটে পড়ল। দৃশ্যের আরম্ভ থেকে যবনিকা পর্যন্ত শুধু হাসি, প্রাণখোলা হাসি। বহুদিনের আবদ্ধ শিল্পরস বোধের যে আনন্দ, তার উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ দেখা দিল আপামর জনসাধারণের মধ্যে, যাকে এক কথায় বলা যায় লোকরঞ্জন শিল্প। ইতিহাসের পাতায় এই শিল্পের নামকরণ হল,—'কমেডি-ডেল-আর্টে' নামে।

স্থান : ভেনিসের কোনও ময়দান।

কাল : ১৬০০ শতাব্দীর রৌদ্রস্নাত এক বিকেল।

ময়দানের একদিকে বিশাল এক বৃক্ষ, নতুন পল্লবে শোভিত। নবীন পুষ্পে-পত্রে সজ্জীবিত, যে গাছের ছায়া শান্ত স্নিগ্ধ। এই ছায়া-সুশীতল বৃক্ষের নিচে দর্শকদের সমাবেশ। বৃক্ষের মূলকাণ্ডের নিকটে অস্থায়ী একটি মঞ্চবেদী বাঁধা হয়েছে। এ মঞ্চ জাঁকজমক ও আড়ম্বরহীন, অতি সহজ ও সরল। প্রসেনিয়ম আর্চের দুদিকে কিছু অংশ ঘেরা, উপরে নীলাকাশ। দৃশ্যসজ্জা অতি সামান্য, উইংসের মতো কয়েকটি দাঁড় করানো আছে মঞ্চের উভয় দিকে এবং তারই পেছনে রয়েছে একটি অঙ্কিত পর্দা,

আঁকা আছে বনের দৃশ্য। মঞ্চসম্মুখে কিছু বেঞ্চ পাতা আছে, তাতে দর্শক বসে আছে ঠাসাঠাসি করে। তাদের পেছনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে বহু নাট্যরসিক। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা কখন শুরু হবে! ধৈর্য মানছে না, তর সইছে না। দর্শকদের মধ্য থেকে ভেসে আসছে নানান উক্তি ও গুঞ্জন, কখনও চিৎকৃত, কখনও শান্তস্বরে। হঠাৎ বেজে উঠল ড্রাম এবং বিউগল। মুখরিত দর্শক মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল। তারা উপলব্ধি করল আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটি আসন্ন।

শুরু হল অভিনয়। উচ্ছ্বসিত দর্শক আনন্দে মুহুর্মুহু হাততালি ও আনন্দোচ্ছ্বাসে সবকিছু মাতিয়ে তুলল। কখনও নাচ, কখনও গান, কখনও ভাঁড়ামি সঙ্গে কথা ও মাইম। এ এক পূর্ব-অনাস্বাদিত রসাস্বাদ। কাহিনী তখনও দানা বাঁধেনি; খণ্ডখণ্ড টাবলো আকারে ঘটনা উপস্থাপিত হচ্ছে। দর্শক চমৎকৃত। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল এ শিল্পের জয়গান।

এইভাবেই অচিন পথে চলা শুরু। জন্ম হল অচলায়তনের বাইরে, উন্মুক্ত অম্বর তলে, ধূসর প্রসারিত রাজপথে বা বনাঞ্চলে নবশিল্প ধারার। এ এক সৃষ্টিশীল সমৃদ্ধ স্রোত। নবজাগরণের উৎসবে অনেক নতুনের সঙ্গে যুক্ত হল আর এক নতুনের, যার জয়োল্লাসের প্রকাশ ও প্রসার দিগন্ত প্রসারিত ও আপামর জনগণের মধ্যে।

'কমেডি-ডেল-আর্ট'-এর আর এক নাম, অল ইমপ্রোভিজো' [All improviso]। 'ইমপ্রোভিজো' শব্দটির অর্থ হচ্ছে এক্সটেম্পো। অর্থাৎ অভিনয়ের সময় মূল কাহিনীকে অক্ষুণ্ণ রেখে, স্থান-কাল বিশেষে কিছু অতিরিক্ত কথা, আচরণ এবং অঙ্গভঙ্গির দ্বারা দর্শকদের মনোরঞ্জন করা। অদ্যাবধি কমেডি ডেল আর্টের কোনও লিখিত নাটক পাওয়া যায়নি, যা পাওয়া গেছে সেগুলি দলের ম্যানেজারের পাণ্ডুলিপি। এতে লিপিবদ্ধ আছে প্রথমে কোন কোন চরিত্র মঞ্চে এসে কী বলবে বা কীরূপ আচরণ করবে এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের উল্লেখও দেখা যায়। এ ভিন্ন দৃশ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত এবং বিশেষ কোনও কোনও বস্তু যদি মঞ্চে ব্যবহার করা হতো তারও উল্লেখ আছে। এইরূপ পাণ্ডুলিপি প্রায় আটশত পাওয়া গিয়েছে। কোনও এক দলের ম্যানেজারের পাণ্ডুলিপির নিদর্শন;

'Enter PULCINELLA, from the sea, he speaks of the storm, the shipwreck and loss of his companions. At this enter COVIELLO, from the other side, he speaks of the same things as PULCINELLA, they see one another and make the lazzi of fear. At last, after lazzi of touching one another, they realize that they have been saved and speak of the loss of their comrades and their master.'

প্রত্যেক দলে থাকতেন একজন ম্যানেজার যিনি দলকে পরিচালনা করতেন। থাকতেন একজন কবি, যিনি গল্প লিখে অভিনেতাদের সেই গল্পের বিষয়বস্তু ও ঘটনা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন। প্রত্যেক দলে আট থেকে দশজন করে অভিনেতা ছিলেন।

এই সকল অভিনেতারা বিশেষ বিশেষ টাইপ চরিত্র অভিনয় করতে পটু ছিলেন। এই সব অভিনেতারা সকলেই ছিলেন পেশাদার। নাট্যকারের বিবৃত কাহিনী এবং ঘটনা অভিনেতারা মন দিয়ে শুনতেন এবং স্থান-কাল বুঝে তারা নিজেরাই সংলাপ তৈরি করে অভিনয় করে যেতেন। তৎকালীন ইতালিতে মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ রীতি প্রচলিত ছিল অর্থাৎ কোনও চরিত্রের অভিনয়ে সেই বিশেষ রীতি মেনে অভিনয় করবার নিয়ম ছিল। সেই সব বিশেষ রীতি মেনে এবং অনুকরণ করে যে সব অভিনেতা কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন, তিনি ততবড় অভিনেতা ছিলেন। প্রথম দিকে মহিলাদের অংশগ্রহণের কোনও প্রশ্নই ছিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা এসে এই সব নাট্যাভিনয়কে সঞ্জীবিত করে তোলেন।

ক্রমশ এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ থেকে এল সাদর আমন্ত্রণ। এতদিনের অনাদৃত শিল্প আজ আপ্যায়িত হল রাজদ্বারে। কমেডি-ডেল-আর্ট শেষে জাতে উঠল! শুরু হল সংমিশ্রণ! শাসকের শিল্প ও শোষিতদের শিল্পের মিলনের ফলে জন্ম নিল সঙ্কর শিল্প। সূচনা হল আর এক নবদিগন্তের, যা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। যে আলোয় রাঙিয়ে ছিলেন শেক্সপীয়র, মলিয়ের এবং আরও অসংখ্য নাট্যকার। শিল্পের জগতে আর এক নবদিগন্তের সূচনা হল কমবেশি এই সংমিশ্রণে ব্যালে ও অপেরার মধ্যে।

এই মিলনের খবর শব্দতরঙ্গে ছুটে চলেছে সুপারসনিক গতিতে দেশ থেকে দেশান্তরে। এই মিলন শত-সহস্র ধারায় প্রবাহিত হল দিকে দিকে, সংযোজিত হল দেশ-বিদেশের নতুন চিন্তা-ভাবনা। জোট বাঁধলেন নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ এবং শিল্পনির্দেশক এক-সারিতে। একে একে নাট্যকারের নাটক, মঞ্চের কৌশল, অভিনয়ের দিক নতুন পথ ধরল। প্রতিদিন নবীন চিন্তায় আপ্লুত হয়ে মঞ্চের রূপরেখার পরিবর্তন হতে লাগল। স্থবিরমঞ্চ এখন চলমান, গতিশীল ও পরিবর্তনশীল রূপ নিল। নাট্যকার নতুন ভাবনায় নাটকের খোল-নলচে পাল্টে দিলেন, ভেঙে দিলেন পুরনো আবদ্ধতা। মিলনে উন্মোচিত হল আর এক নতুন দুনিয়া যা ভাবীকালের দিকদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হল। যা আজকের সময়োপযোগী মঞ্চের নাটকের অভিনয়ের প্রথম ভিত হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেল। নাটকে-অভিনয়ে-উপস্থাপনায় একদিকে রাজকীয় চমক, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, চরিত্র বিকাশের ভাবগম্ভীর রীতি, নাটকের ধ্রুপদী বাঁধুনি, অন্যদিকে কমেডি-ডেল-আর্টের সহজ-সরল, গতিময় উচ্ছল উচ্ছ্বাস, সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত, উপস্থাপনার সরলীকরণ, এই দুই ধারার মিলন ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়ে ভাসিয়ে দিল অনেক পুরনো জমে থাকা, আঁকড়ে থাকা সংস্কার, ভাবনা ও জঞ্জালকে, ঝকঝকে ও পরিষ্কার করে সত্য-শিব-সুন্দরের পসরা মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলল নতুন পথের যাত্রী বিশ্বের দিকে দিকে। নতুনের জয়গানে বিশ্বভুবন মুখরিত হল।

নবজাগরণে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন হল। অতিরিক্ত

উৎপাদিত দ্রব্যের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটাতে বণিকের দল দেশ ছেড়ে ছুটে চলল বিপদ-সঙ্কুল পথ ধরে অচিন দেশের উদ্দেশ্যে। বণিক বেশে অন্য দেশে অনুপ্রবেশ করে ক্রমে সে দেশের শাসনভার ছিনিয়ে নিল। ফলে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য বদলে গেল। নিজেদের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে তারা শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার শুরু করল। ফলে ইউরোপের এই নবতর নাট্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা হল এশিয়া-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায়। আজকের দুনিয়া ওই ধারারই ধারক-বাহক, যদিও দেশে দেশে এই ধারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আজ এক উন্নততর অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি।

যোগসূত্র

ইতালি সহ ইউরোপের অন্য দেশগুলি যখন একটি নতুনতর মঞ্চরীতিতে নাটক উপস্থাপনায় ব্যস্ত তখন সেই একই সময়ে ইংল্যান্ডে ঠিক ভিন্ন প্রকৃতির একটি মঞ্চধারা গড়ে উঠল। এই মঞ্চ রীতিনীতির সঙ্গে রেনেসাঁর নতুন উদ্ভাবিত মঞ্চের কোনও যোগ ছিল না। এ মঞ্চ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নিজের কৌলিন্যের পরিচয় দিল। এ মঞ্চের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই মঞ্চে অভিনেতা ও দর্শকের যোগাযোগ ছিল অতি নিকটতম। মঞ্চ প্রাচীরাবদ্ধ হলেও সাধারণ মানুষের এখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এই যুগটি সর্ব বিষয়ে রেনেসাঁ মঞ্চ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় এর একটি বিশেষ নামকরণ করা হল—এলিজাবেথিয়ান থিয়েটার। অবশ্য তৎকালীন এই মঞ্চধারার পাশে অপর একটি মঞ্চাভিনয় রীতি বিদ্যমান ও প্রচলিত ছিল, যাকে বলা হয়েছে—'কোর্ট থিয়েটার'। এই কোর্ট থিয়েটারের রীতি-নীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের। এই থিয়েটারগুলি পরিচালিত হতো তৎকালীন রাজন্যবর্গ ও সামন্তদের দ্বারা, যার জন্য এই সব মঞ্চের রূপ ছিল বিলাস বহুল এবং চাকচিক্যে পরিপূর্ণ।

একটি নাম, একটি সাল, একটি থিয়েটার,—এই তিনটি ইংল্যান্ড তথা এলিজাবেথিয়ান মঞ্চ ইতিহাসে এক বিরাট স্থান জুড়ে বসে আছে। এদের কোনও একটিকে বাদ দিয়ে বা না জেনে তৎকালীন নাট্য-ইতিহাস জানতে গেলে নিষ্ফল পণ্ডশ্রম হবে। নাম—জেমস বুরবাজ [James Burbage], সাল ১৫৭৬, থিয়েটার—দি থিয়েটার। এই তিনটির ফল হল এলিজাবেথিয়ান যুগের সূচনা। জেমস বুরবাজ ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি। নিজের ব্যবসা ছেড়ে তিনি পরিচিত হলেন একজন অভিনেতা হিসাবে এবং ১৫৭৬ সালে একটি জায়গা লিজ নিয়ে লন্ডনে প্রথম স্থায়ী পেশাদারী মঞ্চ নির্মাণ করেন। এবং নাম দিলেন—দি থিয়েটার। এই সেই প্রথম মঞ্চ যেখানে সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ।

যা হোক, এলিজাবেথিয়ান মঞ্চের ইতিবৃত্ত আলোচিত হবার পূর্বে তার পূর্বাভাসের বিশ্লেষণ কিছু প্রয়োজন।

ষোড়শ শতাব্দীর মঞ্চ একদিক দিয়ে বলা যায় যে মধ্যযুগীয় মিস্ট্রি ও মিরাকল মঞ্চেরই

একটি পরিবর্তিত রূপ অর্থাৎ ওই মঞ্চের পরিপূর্ণ রূপ না রেখে তার সরলীকরণ এবং তাকে যুগোপযোগী করা। এই সরলীকরণের আর একটি কারণ এর অত্যধিক খরচ, ব্যয়বহুল মঞ্চ ইচ্ছানুসারে করা সম্ভব হতো না। অথচ মানুষের মঞ্চশিল্পের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন ক্রমবর্ধমান। মধ্যযুগীয় বিশাল মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে নিয়মিত অভিনয় অসম্ভব ছিল। তাই অনুসন্ধান চলল নতুন কোনও সহজ সরল মঞ্চের। চেষ্টা চলল মঞ্চকে কী করে সহজ, ছিমছাম করে তোলা যায়। পরে এই প্রচেষ্টারই একটি স্থায়ী রূপ এলিজাবেথিয়ান যুগে প্রকাশ পেল।

এরই মধ্যবর্তী অবস্থায় ইংল্যান্ডে অন্য এক প্রকার মঞ্চ ও নাটকের প্রচলন হল, যা ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর। একে বলা হয়েছে ইন্টারলুড। এ গুলিকে ছোট মরালিস্টধর্মী নাটক বলা হয়। হাস্যরসই ছিল এই সব নাটকের প্রধান উপজীব্য। এই ধরনের নাটকের প্রধান সুবিধা ছিল যে অতি অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ে মঞ্চস্থ করা সম্ভব ছিল। এমনকী যে কোনও বড় হলঘরেও উপস্থাপিত করা সম্ভব ছিল। এই প্রকার নাটকের মঞ্চাভিনয়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল তৎকালীন স্কুল-কলেজ। দর্শকের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় একদল পেশাদারী অভিনেতা সৃষ্টি হল এবং এই সব অভিনেতা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানান স্থানে অভিনয় করতে লাগলেন। চাকচিক্যহীন সাধারণ একটি উচ্চ-বেদীই নাট্যক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সময়ের দিক থেকেও এ হল সংক্ষিপ্ত। এক থেকে দেড় ঘণ্টার বেশি এই অনুষ্ঠানে দরকার হতো না। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে উপস্থাপিত নাটক সব সময়ে দর্শকের সহযোগিতা পেয়েছে। দর্শক একাত্ম হয়েছেন নাটকের সঙ্গে। দর্শককে উপেক্ষা করে নাটক তার অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে অক্ষম। তাই দেখা যাচ্ছে দর্শকের চেতনা রুচি শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে মঞ্চ ও নাটক তাদের পূর্বরূপ পালটাচ্ছে ; পূর্বের বিলাস পরিত্যাগ করছে। মঞ্চ ও নাটক এগিয়ে গেল স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার দিকে। এই সব দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা ও সামন্ত। এ ভিন্ন দলগুলি শহর ও শহরতলিতে অভিনয় করে অর্থ উপার্জন করত।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগে আর একটি বিপ্লব ঘটে গেল—গ্রীক-রোমান মঞ্চের রীতিনীতি আবিষ্কারের ফলে সমগ্র ইউরোপের মঞ্চে আরম্ভ হল তার পূর্ণ ব্যবহার। এই রীতি-নীতির সন্ধান পাওয়া গেল আর্কিটেক্ট ভিট্রুভ-এর পুস্তকের মাধ্যমে। আরম্ভ হল ক্ল্যাসিক নীতির পুনরভ্যুত্থান। থ্রি ইউনিটির [ইউনিট অফ টাইম, প্লেস অ্যান্ড অ্যাকশন] মর্যাদা রাখতে মঞ্চ ও নাটক, সজাগ হয়ে উঠল।

ভিট্রুভ-এর মঞ্চের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দুটি কাঠামোকে 'এল'-এর মতো পরস্পর গায়ে লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে ক্যানভাসে মুড়ে রঙ করা হতো। এগুলিকে মনে করা হতো রাস্তার উভয় দিকের গৃহ। মঞ্চসম্মুখের ফ্রেমে একটি করে দরজা বানানো হতো। দরজায় তিনদিকে বর্ডার টেনে সুন্দর কারুকার্য অঙ্কিত করা হতো। এ ভিন্ন ফ্রেমের উপরের দিকে অঙ্কনের উৎকর্ষ, সুকুমার কারুকার্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই দৃশ্যের সর্বপেছনে একটি অঙ্কিত পর্দা বিরাজ করত তাতে আঁকা থাকত দুটি

রাজকীয় দরজা। দ্বিতীয়ত পেরিঅ্যাক্ট [ট্রায়াঙ্গুলার বা প্রিজম আকার] চারটে করে প্রত্যেক দিকে একটি বিশেষ দূরত্বে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। এই পেরিঅ্যাক্টগুলি মঞ্চের উভয় দিকে অবস্থান করত। পেরিঅ্যাক্টের ছিল তিন দিক। এই তিন দিকের এক একটি দিকে একই প্রকার দৃশ্য অঙ্কিত করার নিয়ম ছিল। এই উপায়ে বাকি দুই দিকে অন্যপ্রকার দুটি দৃশ্য অঙ্কিত থাকত। যার ফলে তিনপ্রকার পূর্ণ পৃথক দৃশ্য পাওয়া যেত। দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য ভিট্রুভ এক অদ্ভুত যান্ত্রিক উপায় গ্রহণ করেন। তিনি এই পেরিঅ্যাক্টগুলিকে এক একটি পৃথক পিভটের উপর স্থাপিত করেন। সাবাতিনি পেরিঅ্যাক্টগুলিকে প্রত্যেক দিকে দুটি করে পরপর দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু ভিট্রুভ প্রত্যেক দিকে চারটি করে পারস্পেকটিভ রীতি অনুসারে দাঁড় করান। দৃশ্য পরিবর্তনের প্রয়োজনে এই পেরিঅ্যাক্টের মুখগুলি ঘুরিয়ে দিতেন। মঞ্চ-ইতিহাসে দৃশ্য পরিবর্তনের এ এক বৈপ্লবিক প্রথা।

এ ভিন্ন ভিট্রুভ আরও তিন প্রকার নাটকের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তিন প্রকার দৃশ্যসজ্জার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে ট্রাজেডি সম্বন্ধে বলেছেন যে এই মঞ্চে থাকবে রাজকীয় পিলারের সারি এবং গবাক্ষ। দেওয়ালে থাকবে সুকুমার কারুকার্য এবং বিভিন্ন প্রকার মূর্তি। কমেডি সম্বন্ধে বলেছেন যে এতে থাকবে সাধারণ বাসগৃহ যুক্ত পথ। এই সব বাসগৃহে ব্যালকনি, জানালা ইত্যাদি থাকবে। স্যাটায়ার সম্পর্কে বলেছেন যে এর দৃশ্যসজ্জায় থাকবে গাছপালা, লতাগুল্ম, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। এই সব দৃশ্য অঙ্কিত হবে পর্দায়।

ভিট্রুভ-এর এলসেট তৎকালীন মঞ্চকে নতুন আলো দিল, কারণ এই মঞ্চদৃশ্য ছিল খুব সহজ এবং সাধারণ। এই মঞ্চ নির্মাণে খরচ কম এবং একে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো ছিল অতি সহজ। তাই এর পুরোপুরি ছাপ পড়ল বিশেষ করে ইন্টারলুডের উপর। নতুন কমেডি ও স্যাটায়ার-এর ক্ষেত্রেও ভিট্রুভ-এর পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হল।

মধ্যযুগের ডেকর-সিমুলটানে-রও প্রচলন ও প্রচার শুরু হল ফরাসি মঞ্চ থেকেই। প্রথম দিকে এই প্রথায় নাটকের দৃশ্যগুলি একটি পর্দার বিভিন্ন অংশে অঙ্কিত হতো। ফলে ওই একই পর্দার উপর নদ-নদী, পাহাড়, বন, গৃহ ইত্যাদি অঙ্কিত করে টানিয়ে দেওয়া হতো। বিশেষ বিশেষ দৃশ্যাভিনয়ের সময় অভিনেতারা সেই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে দৃশ্যের অবস্থান বুঝিয়ে দিতেন। তবে ইন্টারলুডে দেখা গেল ডেকর-সিমুলটানের রীতিতে একই পর্দার উপর অঙ্কন বন্ধ করে একই পথে দৃশ্যগুলির ডাইমেনশনাল রূপ দিতে। যদিও এই পদ্ধতির উন্নত রূপটির খবর আসে ফরাসিমঞ্চ থেকেই। ফরাসি মঞ্চবিশারদগণ এ ব্যাপারে চরম নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাদের মঞ্চে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। এই পদ্ধতির ডাইমেনশনাল চরিত্র দেখা দেওয়ার ফলে জোন ভাগ হয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের অবস্থান একই মঞ্চে উপস্থাপিত হতে লাগল। মঞ্চদৃশ্যের এও এক চমৎকার প্রচলন। ইতিহাসের পথ ধরে ভবিষ্যৎ যে

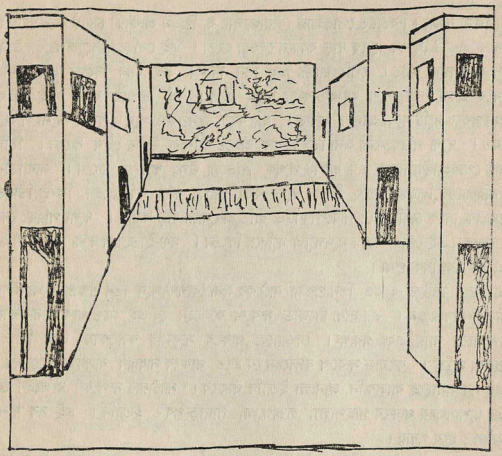

[তৎকালীন এলসেটের নিদর্শন]

গড়ে ওঠে এ তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। কারণ আজ অনেকেই এই পথের পথিক। ক্ষেত্র বিশেষে এতে দৃশ্যের ব্যাপকতা ও বাহুল্য অনেক কমে আসে এবং নাটকের গতি-প্রকৃতিও অনেক প্রাণবন্ত হয়।

এই সব মঞ্চসজ্জার বিভিন্ন বৈচিত্র্যের প্রচলন হয়েছিল শুধু কোর্ট থিয়েটারগুলিতে। ইংল্যান্ডের সাধারণ রঙ্গালয়ের রূপ ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব দৃশ্যরীতির সঙ্গে তার কোনও যোগ ছিল না। এগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে কোর্ট ও স্কুল-কলেজের থিয়েটারগুলিতে।

এলিজাবেথিয়ান

যুগসন্ধানের জন্য অধ্যাবসায়, অধ্যয়ন ও নিষ্ঠার আন্তরিক সমন্বয় না ঘটলে সঠিক চিত্র সংগ্রহ করা কখনওই সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্য না পেলেও প্রতিবেদন উদ্ধারে ব্যাঘাত ঘটে। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে অগ্রগতির জোয়ার বয়ে চলেছে। কখন কোথায় নতুনের বিস্ফোরণ হচ্ছে তার সমসাময়িক খবর পৌঁছাতে কমবেশি দেরি হচ্ছে,

ফলে স্থান-কাল-পাত্রের সঠিক খবর পরিবেশন করা খুবই কঠিন কাজ। তাই যথাযথ সময় ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন থাকলেও অগ্রপশ্চাৎ ঘোরাফেরা করছে। আবার অনেক সময় প্রমাণপত্রের অভাবে শ্রুতির উপর নির্ভর বা যুক্তিপূর্ণ কল্পনার উপর নির্ভর করে মেনে নিতে হয়। এলিজাবেথিয়ান যুগের সম্পর্কে এ কথা গভীরভাবে প্রযোজ্য।

এই যুগের প্রায় প্রথম বিশ বছর ইংল্যান্ডে কোনও প্রকার স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মঞ্চানুষ্ঠান আবদ্ধ স্কুল-কলেজে, ইন-ইয়ার্ডে, কোর্টে, বড় বড় রাজকর্মচারীদের গৃহে। অথচ তৎকালীন মানুষের নাট্যানুষ্ঠানের চাহিদা ছিল প্রবল। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল কিছু শৌখিন দল ও পরে কিছু পেশাদারী দল। কিন্তু নানা প্রকার সমস্যা থাকায় এই দলগুলি স্থায়ী হতো না। শেষে ১৫৭২-এর এক আইনে বলা হল যে, যদি কোনও বিশেষ ব্যক্তিবারা দল পরিচালিত না হয় তবে তাদের অভিনয় করতে দেওয়া হবে না। এর ফলে একদিকে যেমন বেশ কিছু দল উঠে গেল কিন্তু অন্যদিকে কয়েকটি খাঁটি নাটুকে দল তৎকালীন নোবলম্যানদের সাহায্যে পরিচালিত হতে থাকল। ফলে সেই যুগের নাট্য-আন্দোলনের একটি নিশ্চিত দিক চিহ্নিত হল। অবশ্য এই সময়ে লন্ডনে মঞ্চাভিনয় নিয়মিতভাবে করতে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যা হোক, সব প্রকার আপত্তি উপেক্ষা করে ১৫৭৬-এ বুরবাজ 'দি থিয়েটার' নামে পেশাদারী এক স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয় নির্মাণ করেন। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে অনেকগুলি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৬ থেকে ১৬৪২-এর মধ্যে প্রায় তেরোটি থিয়েটার জন্ম লাভ করে। এই রঙ্গালয়গুলি ছিল : দি থিয়েটার [The Theatre] ১৫৭৬, দি কার্টেন [The Curtain] ১৫৮৪-৮৫, দি রোজ [The Rose], দি সোয়ান [The Swan] ১৫৯৪, দি গ্লোব [The Globe] ১৫৯৯, দি হোপ [The Hope] ১৬১৪, দি ফরচুন [The Fortune] ১৬০০, দি রেড বুল [The Red Bull]। এই সময়ে আরও কতকগুলি প্রাইভেট থিয়েটার তৈরি হয়, তাদের মধ্যে : পল'স সিংগিং স্কুল [Paul's Singing School], দি ফ্যারান্ট অ্যান্ড বুরবাজ ব্ল্যাক ফ্রিয়ার্স [The Farrant and Burbage Black Friars], Salisbury Court Rebuilt White Friars, দি ককপিট অথবা ফনিক্স [Cockpit or Phoenix], দি রেড বুল [The Red Bull], নাইপল [Nigh Paul], প্রথম ও দ্বিতীয় ব্ল্যাক ফ্রিয়ার্স [Black Friars] বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[সব কয়টি থিয়েটারের বিশদ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, তবে দুটি থিয়েটারের—'দি থিয়েটার' এবং 'দি গ্লোব' সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে কারণ এই দুটি রঙ্গালয়ের সঙ্গে এলিজাবেথিয়ান নাট্যানুষ্ঠানের যোগ খুব গভীর।]

দি থিয়েটার : লন্ডনের প্রাচীরের বাইরে শেফ লিওনার্ড ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিমে এই রঙ্গমঞ্চটি স্থাপিত হয়। জেমস বুরবাজ ১৩ এপ্রিল, ১৫৭৬-এ গীলস আলেন [Giles Allen]-এর কাছ থেকে এই জায়গাটি ইজারা নেন। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই থিয়েটার তৈরি হয়ে যায়। বাড়িটি ছিল কাঠের এবং সম্ভবত গোলাকার।

গ্যালারির অস্তিত্বের কথাও স্বীকার করা হয়। মঞ্চবেদী স্থায়ী ছিল না। প্রয়োজনে বেদীকে খুলে রাখা হত। কারণ, এখানে অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠান, যেমন নাচগান, ফেনসিং ইত্যাদি হতো। ১৫৯৭-তে যখন লিজ ফুরিয়ে যায় তখন জমির মালিকের সঙ্গে জেমসের ছেলেদের গোলমাল লাগল। এই ঝগড়া প্রায় বছর দেড়েক চলে, অবশেষে বুরবাজের ছেলে কুথবার্ট এবং রিচার্ড এই থিয়েটার ভেঙে ফেলেন এবং এই থিয়েটারের মালপত্র নিয়েই গড়ে তোলেন গ্লোব থিয়েটার।

দি গ্লোব ঃ হোপ থিয়েটারের পূর্বদিকে এবং ম্যাডেন লেনের উত্তরে এর অবস্থান ছিল। ১৫৯৯-তে বুরবাজ সম্প্রদায় দি থিয়েটারের জিনিসপত্র দিয়ে এই মঞ্চটি তৈরি করেন। এই থিয়েটারটিও আকারে গোল ছিল। ১৬১৩-তে নতুন নাটক 'All is true' [Shakespeare's Henry VIII]-এর অভিনয় কালে আগুন ধরে এবং থিয়েটারটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই পুনর্গঠিত হয়। এই বার এর আকার Octagonal হয়, এবং ভেতরের কারুকার্য আগের থেকে অনেক বেশি জমকালো হল এবার। সিভিল ওয়ারের পূর্ব পর্যন্ত এই একটি মাত্র মঞ্চই খাঁটি নাটক অভিনয় করে গেছে। অবশেষে ১৫ এপ্রিল, ১৬৪৪-তে একে ভেঙে ফেলা হয়।

এলিজাবেথিয়ান মঞ্চের যতগুলি ছবি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই কিছু গরমিল আছে। এই ছবিগুলি যাঁরা অঙ্কন করেছেন তাঁরা নির্ভর করেছেন তৎকালীন বিভিন্ন প্রমাণাদি ও খবরাখবরের উপর। অবশ্য শুধু প্রমাণ বা খবরের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেননি এর সঙ্গে মিশেছে তাঁদের কল্পনা ও চিন্তাধারা।

এলিজাবেথিয়ান মঞ্চের বৈশিষ্টের আলোচনায় গেলে দেখা যাবে যে, একটি বেদী প্রসারিত দর্শকগৃহের মধ্যে ; এবং এর তিন দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এই অভিনয়-বেদীকে ঘিরে রয়েছে দর্শকগৃহ। দর্শকগৃহের আকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল সম্ভবত গোলাকার। যারজন্য দর্শক তিনদিক থেকে দেখতে পারত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, এই প্রসারিত বেদীর উপর, পেছন থেকে প্রায় এর অর্ধেক পর্যন্ত একটি ওভারস্টেজ বা ব্যালকনি থাকত। উভয় স্থানেই অভিনয় হত। বিশেষ করে দোতালার ঘর, ব্যালকনির দৃশ্য, নগরপ্রাচীর বা উচ্চবেদী ইত্যাদি দেখাতে ওভারস্টেজ ব্যবহৃত হত। প্রসারিত মঞ্চবেদীর শেষাংশ থেকে শুরু হতো ইনার স্টেজ, যার উপর ওভারস্টেজ থাকত। প্রসারিত মঞ্চ ও মঞ্চ অভ্যন্তর [ইনারস্টেজ]-এর সংযোগ স্থলে একটি পর্দার অস্তিত্বের কথা তৎকালীন প্রায় সব নাটকেই পাওয়া যায়। এ ভিন্ন প্রকাশিত সব ছবিতেই এই পর্দার স্থানের নির্দেশ করা হয়েছে। প্রয়োজনে পর্দা বন্ধ করে নাটকের দরকার মতো আসবাব পত্র ও সামগ্রী রেখে দেওয়া যেত এবং যথা সময়ে পর্দা সরিয়ে একে দর্শক সম্মুখে উন্মোচিত করা হতো। স্থায়ী মঞ্চের দুই দিকে দরজা থাকত যার ভিতর দিয়ে প্রবেশ-প্রস্থান করা হতো। এই প্রবেশ-প্রস্থান দ্বারের কথা নাটকে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মনে হয় যে বিভিন্ন মঞ্চে এই দরজার অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য ছিল। এই দরজা দুটির ঠিক উপরে দুটি জানালায় উল্লেখ করা হয়েছে বহু নাটকে।

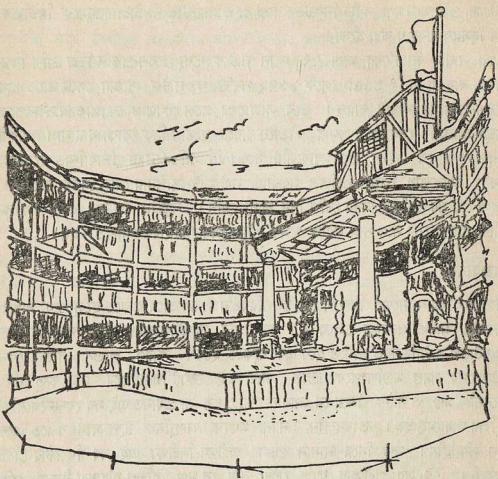

[এলিজাবেথিয়ান থিয়েটার]

তৃতীয়ত হাট [Hut] অর্থাৎ ছোট একটি ঘর ওভারস্টেজের উপর থাকত, এই স্থানেই দেবদেবীগণ আবির্ভূত হতেন। চতুর্থ হচ্ছে ট্র্যাপডোর, প্রসারিত মঞ্চবেদীর বিভিন্ন স্থানে থাকত। এ ভিন্ন ইনারস্টেজ ও ওভারস্টেজে ও এই ট্র্যাপডোরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। একটি প্রধান পর্দার কথা ছাড়াও অন্যান্য পর্দা ছিল। তৎকালীন নাট্যকারগণ কোনও কোনও নাটকে একাধিক পর্দার উল্লেখ করেছেন। তবে শেক্সপীয়র এবং ফ্লেচার নিজেদের দলের জন্য লিখিত বিভিন্ন নাটকে কখনও পর্দার উল্লেখ করেছেন আবার কখনও করেননি। আবার দেখা যায় একই নাটকে কখনও পর্দার উল্লেখ আছে আবার নেইও। ড্রেসিংরুম সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। তবে এটি নিশ্চয়ই ছিল, তবে কী ছিল বা কীরূপ ছিল ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় টায়ারিং রুমকে ড্রেসিংরুম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এই টায়ারিং রুমের অবস্থান ছিল ইনারস্টেজের দুদিকে।

সর্বশেষ মিউজিকরুম। এটি যে কোথায় ছিল বলা শক্ত। তবে মনে করা হয় যে

নাটকের প্রয়োজনে মঞ্চ বেদীর নিকটতম বক্সে বা ওভারস্টেজে বা টায়ারিংরুমকে মিউজিক-রুম হিসাবে ব্যবহার করা হতো।

মঞ্চের নানান নির্দেশের মধ্যে তৎকালীন নাটকে শুধু প্রবেশ-প্রস্থান ভিন্ন বেশি কিছু পাওয়া যায় না না। ১৫৫০ থেকে ১৬৪২ পর্যন্ত যত নাটক পাওয়া গেছে তাতে শুধু প্রবেশ-প্রস্থানের কথাই আছে। তবে সংলাপের মধ্যে কোথাও কোথাও আসবাবপত্রের উল্লেখ আছে। সেগুলি কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হতো সঠিক বোঝা যায় না। একটি বিষয় স্পষ্ট যে এইসব মঞ্চ মধ্যযুগীয় মঞ্চের রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, অর্থাৎ মধ্যযুগীয় কিছু প্রচলিত মঞ্চরীতি নাটক উপস্থাপনায় মেনে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই সব প্রচলিত নিয়ম বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। নতুনের জোয়ার এবং দর্শকের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটক ও মঞ্চ পরিকল্পনার প্রথারও পরিবর্তন হয়।

রাজদ্বারে

এলিজাবেথিয়ান মঞ্চের বিকাশ ও ক্রমপরিবর্তন সম্যকভাবে বুঝতে হলে শুধু সাধারণ রঙ্গালয়ে আবদ্ধ থাকলে চলবে না, তৎকালীন কোর্টথিয়েটার এবং স্কুল-কলেজের থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ও জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। কারণ, লন্ডন, লন্ডন কেন, ইউরোপের সমস্ত মঞ্চশিল্পকে উন্নত করতে এই কোর্টথিয়েটারের দান অতুলনীয়। রেনেসাঁর মঞ্চ ও নাটক নিয়ে যে জয়যাত্রা শুরু হয় তা প্রধানত এই সব কোর্টথিয়েটার-গুলির মাধ্যমেই হয়। তৎকালীন অন্যান্য মঞ্চকে আধুনিক রূপ দান করতে এদের দান সীমাহীন। মঞ্চ নিয়ে নানান প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই সব থিয়েটারগুলিই করেছে। এই সব পরীক্ষায় ফলে দেখা যায় যে মঞ্চ বিভিন্ন বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডি ভেঙে বিকাশের বহু বিচিত্র পথ ধরেছে। ১৫৪৩-এর পূর্ব পর্যন্ত এইসব কোর্ট-থিয়েটার ব্যস্ত ছিল মাস্ক ও পেজেন্ট অভিনয় নিয়ে। খাঁটি নাটকের আমদানি তখনও হয়নি। কিন্তু এই সময়ই মঞ্চের রূপের পরিবর্তন শুরু হলে নাটকের গঠনেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। খাঁটি নাটকের তাগিদ আসতে আরম্ভ করল। মঞ্চে এল রেনেসাঁর মঞ্চরীতির জোয়ার। ইতালিয়ান মঞ্চের ধারা প্লাবিত করল সমগ্র ইউরোপকে। এল ফ্রান্স মঞ্চের ডেকর সিমুলটানে। ক্রমে জন্মলাভ করল ডেকর—সিমুলটানের একত্রিত দৃশ্যের পৃথক সত্তা অর্থাৎ একটি দৃশ্য—বহুল নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যের পৃথক রূপ ও রেখা, পৃথক সত্তা নিয়ে মঞ্চস্থিত হতে লাগল।

প্রথমাবস্থায় কোর্টে আনন্দোৎসবের মাধ্যম ছিল নাচগান। প্রকৃত নাটকের স্থান খুব কম ছিল। নাটক নামে যেগুলিকে মঞ্চস্থ করা হত, সেগুলিকে আসলে নাটক বলা যায় না। কারণ সংলাপের অংশ এতে খুব কম, নাচগানই প্রধান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই ধারার একটি পরিবর্তন দেখা দিল। নৃত্যগীত ও সংলাপের মিলন ঘটল, ফলে জন্ম নিল দুটি পৃথক ধারা,—(১) মাস্ক বা ডিসগাইসিং এবং (২) পেজেন্ট। এই দুই ধারার প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। মাস্কের বৈশিষ্ট্য

ছিল যে, একদল লোক বিভিন্ন রূপসজ্জার হলঘরে ঢুকে নেচে গেয়ে এবং নানান অঙ্গভঙ্গি করে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দিত। মাঝের মধ্যে নাচ এবং মাইমই প্রধান ছিল। পেজেন্টের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একটি মঞ্চবেদী বিশেষভাবে তৈরি হতো এবং তার উপর সজ্জিত হতো অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যা কিছু,—যেমন গীর্জার অংশ, রাজপ্রাসাদের অংশ, সূর্য, চন্দ্র আরও কত কী,—সবই রূপকাকারে। দ্বিতীয়ত এই মঞ্চবেদীটির নিচে চাকা লাগিয়ে দেওয়া হতো এবং সময়মত এই চলন্ত মঞ্চটিকে ঠেলে হলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এই অনুষ্ঠানটি আপাতদৃষ্টিতে রূপকধর্মী এবং বিভিন্ন দৃশ্যে বা পরিবেশে বিভক্ত ; অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনা ছোট ছোট দৃশ্যাকারে উপস্থাপিত হতো। এতে সংলাপের অংশ ছিল অল্প, প্রধান ছিল গান। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ হরেক রকমের জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে মঞ্চে উপস্থিত হতো।

পৃথকভাবে কি মাস্কে অথবা পেজেন্টের ভেতর উল্লেখযোগ্য কোনও মঞ্চরীতির বা নাট্যরীতির সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে যখন এই দুয়ের মিলন ঘটল তখন জন্ম নিল অন্য নতুন এক প্রকার মঞ্চাভিনয়, যাতে নাচ-গান-বাজনা প্যান্টোমাইম সংলাপ মিলিত হল। মঞ্চসজ্জা জমকালো রূপ নিল। পেজেন্টের আকার আরও বৃহৎ হল এবং একাধিক পেজেন্ট প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হল ; অর্থাৎ দৃশ্যের পূর্ণরূপ সহ পৃথক সত্তাকে পৃথক পৃথক পেজেন্টে স্থান দেওয়া হল। দৃশ্যও আরও পরিপূর্ণতার দিকে বেশ এগিয়ে গেল। ১৫৭২-এর পূর্ব পর্যন্ত এই ধারার একটি স্পষ্ট গতি কোর্ট থিয়েটারে বিদ্যমান ছিল। ক্রমে এই ধারার বিলুপ্তি ঘটে।

কিছুদিনের মধ্যেই নতুন এক প্রকার নাট্যধারার জন্ম হয়, এগুলি ইন্টারলুড [Interlude] নামে পরিচিত। এগুলি ছিল মরাল ধর্মী নাটক এবং রস বিচারে ফার্সিকাল [Farcical]। এই নাটক মঞ্চাভিনয়ের রীতি অতি সাধারণ ও সরল। দৃশ্যসজ্জা ও পোশাকের বিলাস নেই। প্রয়োজনের বাইরে কোনও কিছুর স্থান ছিল না। সাধারণ একটি উঁচু বেদী এই অভিনয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। স্বল্প রূপসজ্জায় এবং স্বল্প পরিবেশে এ উপস্থাপনা উতরে যেত। কিন্তু পেজেন্টের চাকচিক্য ও জাঁকজমকের পাশে এই সরলীকরণ তৎকালীন অনেকের পছন্দ হল না, কারণ তাঁরা এর মধ্যে শিল্পসত্তার কোনও ছোঁয়াচ পাননি। তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ও নব পরিচিত বুর্জোয়া সভ্যতার এ এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া! উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে তারা নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল ফলে সহজ ও স্বাভাবিকতাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদেরই দলভুক্ত একদল লোক একে সহজভাবে গ্রহণ করে এর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এল। এই সময় নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের প্রতি দর্শকের আকর্ষণ ছিল প্রবল, তারা এদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল, ফলে কিছুদিনের জন্য এর টিঁকে থাকা সম্ভব হয়েছিল। পেজেন্ট-আকারে নাট্য-উপস্থাপনায় এত খরচ ছিল যে নিয়মিত একে মঞ্চস্থ করা ছিল অসম্ভব ; তাই ইন্টারলুডের যাত্রাপথ সুগম হয়েছিল। যদিও কিছু দিনের মধ্যেই এ পথেরও

পরিবর্তন হয়, কারণ ইতালির জাঁকজমকময় বাস্তবমুখি মঞ্চসজ্জা সব কিছুকে মুছে দিল।

১৫৭২ থেকে ১৫৮৩ পর্যন্ত দেখা যায় কোর্তথিয়েটারের প্রধান অভিনেতা ছিল সব কিশোর বালক। কোর্তথিয়েটারের অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিল নাচ-গান ক্রমে সংযোজিত কাহিনী। এই সব কাহিনী সাধারণত পৌরাণিক বা রূপকধর্মী। নাট্যাকারে যখন এগুলি পরিবেশিত হতো তার প্রধান উপজীব্য ছিল হাল্কা হাস্যরসাত্মক বিষয়। কিন্তু এই নাট্যধারার প্রবাহ বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারল না ; কারণ কোর্তথিয়েটারের বাইরে এক প্রচন্ড শক্তিশালী নাট্যধারার সৃষ্টি হয়েছে। শেক্সপীয়র, মারলো, ফ্লেচার-এর শক্তিশালী নাটক ও তার উপস্থাপনারীতি তৎকালীন লন্ডনবাসীর মন সম্পূর্ণ জয় করে নিয়েছে। এই ধারা জাঁকিয়ে বসল কোর্তথিয়েটারের মধ্যে। এর শুরু ১৫৮৩ থেকে। এই সব নাট্যকার ও পরিচালকদের পেয়ে কোর্তথিয়েটারগুলি ফলে-ফুলে বিকশিত হল, নবযৌবনে সকলকে আকর্ষিত করল। কোর্তথিয়েটারে দেখা গেল পেশাদারী অভিনেতাদের। ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে নাট্যশিল্পের অগ্রগতি শুরু হল ধাপে ধাপে।

রিয়াঁভেন্যু

মঞ্চশিল্পে রেনেসাঁর উৎপত্তি স্থল ইতালি হলেও তার প্রকৃত প্রসার ও গভীরতা দেখা গেল ইউরোপের অন্যান্য স্থানে। প্রথমাবস্থায় না হলেও পরে ফ্রান্সই সকলের মধ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

নবজাগরণে সমগ্র ইউরোপ যখন সৃষ্টির আনন্দে প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে, ইংল্যান্ড তখন রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত, 'রাজরক্ত চাই'—সকলের মুখে ওই এক কথা। শেষে রাজরক্ত নেওয়া হল। কিন্তু ওই রাজরক্তের জন্যে সমাজের মধ্যে কখন যে বিশৃঙ্খলা তার আসনটি জমাট কঠিন করে নিয়েছে, তা প্রথমে কেউ টের পায়নি। তখন অলিভার ক্রমওয়েলের কঠিন শাসনে সে বিশৃঙ্খলা পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার চাহিদা আসতে শুরু করল,—সে চাহিদা মননশীলতার, শিল্পের, সাহিত্যের, দর্শনের ইত্যাদি।

ফ্রান্সের অবস্থাও তদ্রূপ। ধর্মযুদ্ধ শেষ হয়েছে। দেশের চারিদিকে হাহাকার, সে হাহাকার ব্যথার। কেন না যুদ্ধের ফল কখনওই ভাল হয় না—তা কি জয়ে, কি পরাজয়ে। সমাজ পঙ্গু, বিশৃঙ্খলায় ভরপুর ; এর সঙ্গে আছে ছোটখাট নোবলদের অত্যাচার। সাধারণ মানুষ সব সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকত। এই প্রকার নানারূপ ওঠা-নামার মধ্যে দিয়ে প্রায় ১৬২৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স এগিয়ে এল। তাই ১৬২৪-এর পূর্ব পর্যন্ত যে পরিবেশ ফ্রান্সে ছিল তা কোনও কিছু সৃষ্টি হবার অনুকূলে নয়। এই সময় রাজা হলেন ত্রয়োদশ লুই। লুই এবং তাঁর মন্ত্রী কার্ডিনাল—রিচলুর শাসনে ফ্রান্সে এল সমাজবন্ধন, এল শান্তি। এল সৃষ্টির অনুপ্রেরণা সর্বদিকে।

নানা বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স একেবারে শিল্প বিমুখ হয়নি। ওর মধ্যে যতটুকু

সম্ভব তার গতিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। তাই দেখা যায় যুদ্ধের মধ্যেও চতুর্থ হেনরি নাট্যকার ও অভিনেতাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন। এই সময় ফ্রান্সের প্রধান নাট্যশালা ছিল হোটেল বুরগোইন [Hotel de Bourgogne]। প্যারির এই নাট্যশালাটিকে প্রথম জাতীয় নাট্যশালা হিসাবে তখন গ্রহণ করা হয়। তবে হার্ডি [১৫৭০-১৬৩১] এই মঞ্চে আসবার পূর্ব পর্যন্ত এর বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। হার্ডির পূর্বে এখানে যে সব নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় সেগুলি ছিল স্থূল ফার্স এবং অশ্লীল চরিত্রের। হার্ডি এই মঞ্চ নেবার পর নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন উপস্থাপনা রীতি প্রয়োগ করেন।

এই সময়ে ফ্রান্সে অনেকগুলি ভ্রাম্যমান নাটসম্প্রদায় ছিল ; হার্ডি এইরূপ একটি দলের নেতা ছিলেন। এইসব ভ্রাম্যমান দল সাধারণত তিনপ্রকার নাটক করত,—যেমন ট্রাজেডি, কমেডি এবং স্যাটায়ার। দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে তারা সারালিওকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করে চলত। এ ভিন্ন মঞ্চের প্রয়োজনীয় অন্যান্য আসবাব পত্র স্থানীয় পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা হতো।

এই সময় মধ্যযুগীয় ডেকর সিমুলটানে [Décor-Simultanée]-এর পুনর্ব্যবহার হতে দেখা গেল।—দেখা যায় একই পর্দায় অঙ্কিত নানা পরিবেশ,—যেমন একদিকে পথের দৃশ্য, তারই পাশে বহু পিলারযুক্ত অট্টালিকা, আর অন্যদিকে একটি বনের দৃশ্য। এই ধরনের পর্দার সামনে সব রসের নাটক অভিনীত হত। ক্রমে বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে অন্যপ্রকার পর্দার প্রচলন আরম্ভ হল। যদিও এদের রীতিনীতি এক,—যেমন একই পর্দায় ড্রয়িংরুমের একাংশ, গ্রাম্য পরিবেশ এবং রাজপ্রাসাদ। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করবার যে পূর্বের পর্দাগুলি যদিও ডেকর-সিমুলটানের রীতিতে অঙ্কিত কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভিট্রুভ-এর বর্ণিত ট্রাজেডি, কমেডি ও স্যাটায়ারের দৃশ্যের প্রতি। এখন এই পরিবর্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ডেকর-সিমুলটানেকে মেনে নিয়েও দৃশ্যের রূপের তারতম্য ঘটেছে। অর্থাৎ উল্লিখিত ভিট্রুভ-এর তিন প্রকার দৃশ্যের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নাটকের চাহিদা অনুসারে অন্য প্রকার দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে,—যেমন ড্রয়িংরুম, গ্রাম্যপরিবেশ ইত্যাদি।

এগিয়ে যাবার গতি যখন দুর্বার তখন তাকে রুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই ডেকর-সিমুলটানের মধ্যে সংযোজিত হল নতুন বস্তু, অর্থাৎ সবই আঁকা, শুধু আঁকা নেই ড্রয়িংরুমের বা শোবার ঘরের অংশটি। অঙ্কিত অংশের স্থানে এল একটি উঁচু বেদী এবং তার পেছনে দরজাযুক্ত একটি ফ্লাট যা প্রতিষ্ঠিত করল একটি ঘরের অবস্থান। শুরু হল আর এক পরিবর্তনের জয়গান। সংযোজিত হল অঙ্কিত পর্দার সঙ্গে ডাইমেনশনাল ফ্রেমযুক্ত দৃশ্যাংশ।

১৫৯৯। হার্ডি লিজ নিলেন হোটেল দ্য বুরগোইন্,—সমস্ত জিনিসপত্র-সহ মঞ্চ-কুশলীদের। এই মঞ্চকুশলীদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন একজন বিখ্যাত শিল্প-নির্দেশক ম্যালও [Laurent Mahelot] যিনি মঞ্চসজ্জাকে সর্বদিকে আধুনিক

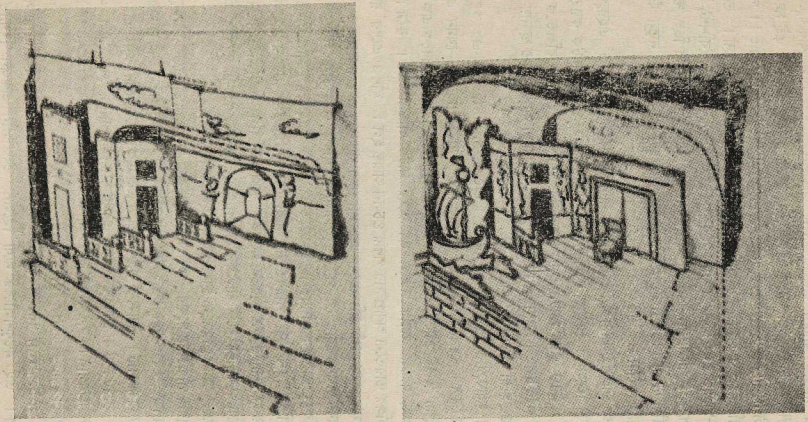

[ডেকর সিমুলটানে ক্রমে অঙ্কিত পর্দা ছেড়ে গঠনপ্রক্রিয়ার মধ্যে ডাইমেনশন পাচ্ছে]

করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। হার্ডি গণতান্ত্রিক ছিলেন। তাই তৎকালীন বিভিন্ন দলের দলপতি ও অভিনেতারা যখন তাঁকে অনুরোধ জানাল যে তিনি যেন ওই মঞ্চের প্রচলিত রীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, তখন কিন্তু হার্ডি এইসব অনুরোধকে উপেক্ষা করেননি। তিনি সমসাময়িক দর্শকের চাহিদা জানতেন। তিনি বুঝেছিলেন যে দর্শক চাইছে দৃশ্যের নতুনতর বিকাশ। তাই তিনি পুরাতন ও সমসাময়িক যুগের সমন্বয়ে এক নতুনতর ডেকর-সিমুলটানে তৈরি করালেন। এতে উভয় দিকই রক্ষা পেল। অবশ্য এই সৃষ্টির মূলে প্রথম ও প্রধান হলেন লোরয় ম্যালও। হোটেল দ্য বুরগোইন্-এ ইনি প্রথম ডাইমেনশনাল ডেকর-সিমুলটানে প্রয়োগ করেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট ছিল যে, পুরাতন বাঁধাধরা গণ্ডি ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি নতুন শিল্পরূপ। এই সময় থেকে মঞ্চে দুটি পৃথক ধারা স্পষ্টতর হয়ে উঠল,— [১] ক্ল্যাসিক নাটক উপস্থাপনায় পুরাতন প্রয়োগ রীতির প্রতি অনুকম্পা, [২] দ্বিতীয় ধারায় নতুন নতুন মঞ্চ ও দৃশ্য প্রচলনের আরম্ভ—যার মূলে ছিল ব্যালে ও অপেরা। তবে একটি ব্যাপার খুব স্পষ্ট যে ১৬৪৫-এর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে মঞ্চ নিয়ন্ত্রণে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। ক্ল্যাসিক ইউনিটিকে স্থান দেবে নাকি ডেকর-সিমুলটানেকে মঞ্চে ব্যাপক ব্যবহার করবে? নাকি নতুনতর দৃশ্যের অবতারণা করবে! কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না। তখন পরীক্ষা চলল বিভিন্ন ধারায়। এই বিভিন্ন ধারার মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে সেইসব মঞ্চসজ্জা যেখানে, প্রচলিত আড়ম্বরপূর্ণ পথকে পরিত্যাগ করে, নতুন বাস্তবমুখি যুক্তিপূর্ণ দৃশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

১৬৪৫ থেকে ১৬৫০-এর মধ্যে মঞ্চে বিপ্লবের জোয়ার এল। এর প্রত্যেকটি শাখার পরিবর্তনের মধ্যে ছিল এক নাটকীয় চমক। প্রথমত, পূর্বালোচিত ডেকর-সিমুলটানের একটি চমৎকার উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যখন আমরা দেখি হার্ডির—'ফোলি দ্য ক্রিডামা'-র মঞ্চসজ্জা। ম্যালও ডেকর-সিমুলটানেকে পর্দায় অঙ্কিত না রেখে এর কিছু কিছু অংশের ডাইমেনশনাল রূপ দিতে আরম্ভ করেন। নাটকে দৃশ্য ছিল—একটি রাজপ্রাসাদ, একটি শয়নকক্ষ ও একটি সমুদ্রতীর। ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে তিনি কীভাবে এইসব দৃশ্যের সংমিশ্রণে একটি পূর্ণ দৃশ্যের রূপ এনেছেন! এই দৃশ্যসজ্জা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মঞ্চের প্রায় পেছনের দিকে মধ্যের স্থানটিতে রাজপ্রাসাদ, মঞ্চসম্মুখের ডানদিকে সমুদ্রতীর এবং বাঁদিকের সম্মুখে শয়নকক্ষ তৈরি করেছেন। মঞ্চসম্মুখের মধ্যভাগটি ছিল সাধারণ অভিনয় ক্ষেত্র। এখানে দেখা যাচ্ছে যে মঞ্চসজ্জা আর সেই তথাকথিত পর্দার মধ্যে আবদ্ধ নেই। পৃথক পৃথক পরিবেশের পৃথক সত্তা তার নিজস্ব রূপ নিতে প্রয়াস পাচ্ছে। ম্যালও এই মঞ্চে রাজপ্রাসাদ নির্মাণে সরাসরি ফ্ল্যাট ব্যবহার করেছেন। সমুদ্রতীর বোঝাবার জন্য একটি জাহাজের মডেল তৈরি করে মঞ্চে বসিয়ে দিয়েছেন এবং তার সম্মুখে রেখেছেন ঢেউয়ের কাট-আউট। শয়নকক্ষ বোঝাবার জন্য তিনি

একটি দরজাযুক্ত ফ্ল্যাট ব্যবহার করেন। এই ফ্ল্যাটের সামনে একটি বেদীর অস্তিত্বের কথা জানতে পারা যায়। যদিও এই দৃশ্যসজ্জার মধ্যে পরিমিতির অভাব পরিলক্ষিত কিন্তু দৃশ্যের পৃথক রূপের ইঙ্গিত আমাদের নিকট সহজে পৌঁছে যায়। ক্রমে আমরা দেখতে পাব যে এইসব একান্বিত দৃশ্য পৃথক হয়ে তার পূর্ণ রূপ নিচ্ছে। এই মঞ্চের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে দৃশ্যের সর্বশেষে একটি অঙ্কিত পর্দা এবং স্কাই। ঠিক সাবাতিনির অনুকরণে ব্যবহার করা হয়েছে :—অর্থাৎ আর্চ-আকার স্কাই যা প্রথমাবস্থায় সাবাতিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর নিজের দৃশ্যসজ্জায়। দৃশ্যের পৃথক সত্তা বোঝাবার জন্য অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থান একটা ভূমিকা পালন করত। যেমন রাজপ্রাসাদের দরজা দিয়ে যখন কোনও শিল্পী প্রবেশ করত, তখন মনে করা হতো যে এটি রাজ-প্রাসাদের দৃশ্য। এইভাবে দৃশ্যাভিনয়ের পৃথক অস্তিত্ব প্রকাশ পেত। এই প্রথার সুবিধা হল, এখানে দৃশ্য পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই ছিল না। ক্রমে অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রয়োজনে কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, তাও আমূল পরিবর্তন নয়, যৎসামান্য। যেমন, দৃশ্যের কোনও ফ্ল্যাটের এক দিকে রয়েছে যে দৃশ্য তার ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে অন্য দৃশ্য ;—এই উভয় দিকে দৃশ্যযুক্ত ফ্ল্যাট বা কখনও প্রিজম-আকারের দৃশ্য ব্যবহার করা হতো। দৃশ্য পরিবর্তনের সময় এইগুলি ঘুরিয়ে দিলেই নতুন দৃশ্যের রূপ প্রকাশ পেত। দৃশ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে তখন ভ্যানিশিং-ট্র্যাপ-এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। এই ট্র্যাপের সাহায্যে অকস্মাৎ আবির্ভাব ও অন্তর্ধান দেখানো সম্ভব হয়।

দৃশ্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হরেকরকম কলাকৌশলের তাগিদ বাড়তে থাকে ; ফলে থিয়েটার হলের গঠন-প্রকৃতির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। এই গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তনের প্রধান জায়গাই হল মঞ্চ, অর্থাৎ মঞ্চের উপর এবং নিচে যথেষ্ট স্থানের প্রয়োজন দেখা দিল। পটপরিবর্তনের প্রধান জায়গা মঞ্চের উপর এবং মঞ্চ-বেদীর নিচে। এই সময়ে যতগুলি প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হল তাতে রিংগংলফট ও বিলোস্টেজের নির্মাণে বিশেষ জোর দেওয়া হল। রিংগংলফট ও বিলোস্টেজ তৈরি হবার পর দৃশ্যসজ্জার ব্যাপকতা বেড়ে গেল সেই সঙ্গে কলাকৌশলের অসংখ্য চমক উপস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করল। মিস্ট্রি-মিরাকল-এর দেবদেবীগণ আগে গির্জার উপরে আবির্ভূত হতেন, এখন তাঁরা সরাসরি মঞ্চের উপর থেকে মঞ্চবেদীতে নেমে এলেন।

এই সময়ের নাট্যকার, পরিচালক ও শিল্প-নির্দেশকগণ এক বিচিত্র সমস্যার মধ্যে বিরাজ করতেন। কোনটি যে ঠিক পথ তা কেউ দৃঢ়ভাবে বলতে পারছেন না! তাদের সামনে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক ট্রাজেডিগুলি, সেনেকার রক্তারক্তি এবং মধ্যযুগীয় মিস্ট্রি-মিরাকল-নাটক। এগুলির হাতছানি এবং সঙ্গে রয়েছে নতুন কিছু সৃষ্টির অনুপ্রেরণা,—সর্বোপরি ব্যালে ও অপেরার অগ্রগতি! এ ভিন্ন তৎকালীন সমাজ, দর্শন ও রাজনীতি তাঁদের আবৃত করে রেখেছে,—টানমাটাল অবস্থা! অথচ এগিয়ে যেতে হবে, নতুনের আহ্বানে তাঁরা প্রায় বেসামাল! এই রকম এক অপরিমিত অবস্থার মধ্যে যখন তাঁরা

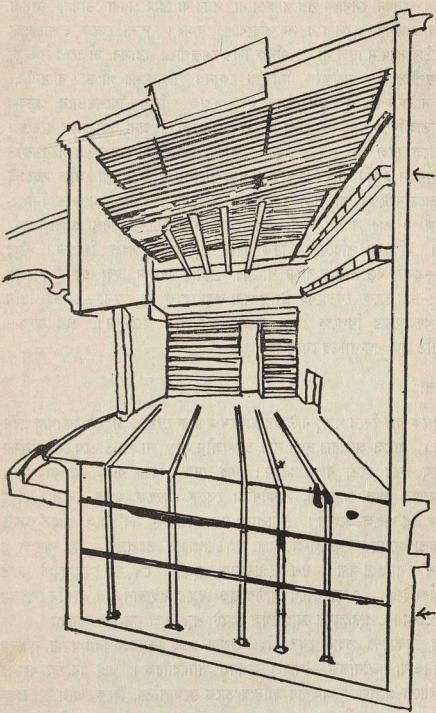

[এই মঞ্চ-পরিকল্পনার প্রধান ভিত ছিল প্রসেনিয়মের উপর দৃশ্য ঝুলিয়ে রাখার জন্য মাচা ও গ্রীড আয়রনের ব্যবস্থা এবং মঞ্চের নিচে উপযুক্ত স্থান রাখা যাতে ট্র্যাপ ও ঠেলা সিন্ অবাধে চলাফেরা করতে পারে।]

বিরাজ করছেন তখন ফরাসি নাট্যকার কয়নেই বললেন, এমন একটি মঞ্চ তৈরি করা হোক যা সর্বপরিবেশের উপযোগী। অর্থাৎ কোনও বিশেষ স্থান বা অবস্থানকে না বুঝিয়ে

সর্বমুখি হোক। যেমন সেখানে প্রশ্ন থাকবে না পারি বা রোম অথবা ভেনিস,—অথবা ক্লিওপেত্রার ঘর বা রাজপথ,— সে হবে সর্বপরিবেশের বাসর। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের পট পরিবর্তনে তাঁর সমর্থন ছিল না। এদিক দিয়ে শেক্সপীয়র, রেসিন, মলিয়ের কিছুটা বিপরীত। শেক্সপীয়র তাঁর নাটককে নির্দিষ্ট কোনও পরিবেশের গণ্ডিতে বাঁধেননি। তবে তিনি যখন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তখন পৃথক পৃথক পরিবেশ বিশেষভাবে গড়বার চেষ্টা করে পূর্ণতার দিকে যাননি। তাঁর মঞ্চের গঠনপ্রকৃতির জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। যতটুকু না করলে চলে না তাই করেছেন। কারণ, এলিজাবেথিয়ন মঞ্চের গঠনপ্রকৃতি এমন ছিল যে সেখানে একটি পরিবেশ থেকে পৃথক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা অতি সহজেই সম্ভব ছিল। তাতে নাটকের গতিপ্রকৃতির কোনও তারতম্য ঘটত না। মঞ্চে ভ্যানিশিং-ট্র্যাপ, ইনারস্টেজ ও তার সামনে পর্দা, উপরে ব্যালকনি নাটকের অবস্থা ও পরিবেশের সহায়তা করত। মলিয়ের পরিবেশের দিক দিয়ে খুব সহজ সরল ছিলেন। তাঁর নাটকের দৃশ্য,—একটি বড়লোকের বাড়ি বা ঘর, প্রমোদ-উদ্যানে এবং একটি নগরপথ পেলেই যথেষ্ট ;—তা তাকে যেভাবেই উপস্থাপনা করা হোক না কেন,—তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। দৃশ্যবদলানোর বিপক্ষে তিনি কখনও ওকালতি করেননি। তবে ডেকর-সিমুলটানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিল।

ব্যালে-অপেরা

ব্যালে ও অপেরাকে বাদ দিয়ে শুধু নাটকের মাধ্যমে মঞ্চকে দেখতে চাইলে কোথায় যেন ভুল থেকে যায়। ব্যালে-অপেরার ছায়া যদি তৎকালীন মঞ্চে না পড়ত তবে সেই সময়ের মঞ্চের মুক্তি যে কবে হতো বলা কঠিন। এই দিক দিয়ে ব্যালে-অপেরা মঞ্চের মুক্তিদাতা। মঞ্চের সমস্ত আবদ্ধতা, সংকীর্ণতা থেকে মঞ্চকে মুক্তি দিয়েছে বহু বিকাশের দিকে এই ব্যালে-অপেরা। বৈচিত্র্যময় মঞ্চ—জগৎকে সর্ব রঙে রঞ্জিত করতে সে সর্বদা সহায়তা করেছে। ব্যালে-অপেরার জগত রঙ্গরসে ভরপুর। তার আলো ও বর্ণের ছটায় দর্শক রাঙিয়ে যায়। দর্শক প্রশংসায় মুখর। সে মঞ্চ মোহসৃষ্টি করত দর্শকের অন্তরে-বাইরে। এ সব দেখে নাট্যকারও দূরে রইলেন না। তিনি পেলেন নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। পুরাতনের মোহ গেল কেটে, শুরু হল নতুনের জয়যাত্রা।

ব্যালে-অপেরার বিকাশের প্রধান কেন্দ্র ছিল উৎসব,—এই উৎসব কখনও ধর্মীয়, কখনও সামাজিক, কখনও-বা রাজনৈতিক,—আবার কখনও পারিবারিক। এই বিভিন্ন ধরনের উৎসবের মধ্যে ব্যালে-অপেরাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৬০০-র প্রথম দিকে দেখা যায় অতি সাধারণ অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের নিম্নস্তরের লোক এই দৃশ্যশিল্পের উদ্যোক্তা। তখনকার উন্নততর মঞ্চশিল্প রাজপ্রাচীরে বন্দী থাকায় সাধারণ লোক এর সংস্পর্শে আসতে পারত না। তাই তারা নিজেরাই আনন্দলাভের মাধ্যম হিসাবে সৃষ্টি করল এই ব্যালে-অপেরা। এই মঞ্চশিল্পের প্রকাশের মাধ্যম নৃত্য-সঙ্গীত [কণ্ঠ ও যান্ত্রিক] ও আবৃত্তি, আবার সঙ্গে কোথাও

প্যান্টোমাইম। এর বিষয়বস্তু ছিল রূপকগল্প অথবা ধর্মীয় প্রচার। ব্যালে-অপেরার প্রথমাবস্থায় হাটে-মাঠে-ঘাটে একটি উঁচু বেদী এবং তার তিনদিক একটু ঘেরা হলেই অনুষ্ঠান অতি-সহজে হতে পারত। ক্রমে এর জনপ্রিয়তা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্বারে আমন্ত্রণ পেল। অনুষ্ঠানের চমকে ও আকর্ষণে রাজপ্রাসাদ আন্দোলিত হল। ফলে এই শিল্পের তাগিদে কিছু নতুন মঞ্চ জন্ম লাভ করল।

রাজানুগ্রহ পাবার পর ওই মহাদেশে হল তার প্রচার। বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ থেকে আন্তরিক স্বাগত জানান হল। ইতালি থেকে বিভিন্ন সংগঠন গেল সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। অন্যান্য দেশের শিল্প ও রসিক দর্শক পেল নতুনতর শিল্পের সন্ধান। বিস্ময়ে ও আনন্দে তাঁরা নিজেদের দেশে অনুকরণ করলেন এই শিল্পের উৎকর্ষ ও রীতি।

প্রথমাবস্থায় ব্যালে অপেরায় কোনও নাটকীয় কাহিনীর স্থান ছিল না। এর বিশেষ দৃশ্য সংঘটিত হতো বিশেষ কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে; এমন কি ঘটনাবলির মধ্যে পারম্পর্য বা সম্বন্ধ না থাকাও অসম্ভব ছিল না। এর বড় আকর্ষণ ছিল নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করা,-অর্থাৎ অ্যাকশন এবং ম্যানায়। ম্যানায়ের প্রশ্নে আবার যে যার দেশের প্রচলিত রীতির উপরই নির্ভর করত। এর সঙ্গে মিলিত হতো সঙ্গীত ও নৃত্য। প্রচলিত চরিত্র রূপায়ণে প্রচলিত পোশাকও যথেষ্ট সাহায্য করত। কয়েকটি ঘটনা বা দৃশ্য মিলে একটি পূর্ণ ব্যালে বা অপেরার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হতো। এই সব অনুষ্ঠানের প্রধান দিক ছিল হাস্যরসে পূর্ণ অথবা মন মাতানো সঙ্গীত ও চোখ ধাধানো দৃশ্যে ভরা। ধীরে ধীরে এতে পূর্ণ কাহিনী সংযোজিত হল।

ব্যালে অপেরার অগ্রগতির সঙ্গে মঞ্চের রূপ এবং মঞ্চ-ব্যবহারের বৈচিত্র দেখা দিল। এই সময়ে যে সব নতুন মঞ্চ তৈরি হল তাতে মঞ্চবেদীকে বাদ দিয়েও মঞ্চের তিনদিকের ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যান্ত্রিক যোগাযোগ যাতে সহজে হতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। কারণ, এই সময়ের মঞ্চে যন্ত্রের ব্যবহার চালু হয়। এই সব যন্ত্র দৃশ্যসজ্জা ও চরিত্র বিশেষের আবির্ভাব ও প্রস্থানে বিরাট সাহায্য করত। নিত্যনতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং তাকে মঞ্চের প্রয়োজনে ব্যবহার তৎকালীন শিল্প নির্দেশকদের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সময়ে দৃশ্যসজ্জাকরদের স্থান মঞ্চে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি এও দেখা গেছে যে তারা নতুনতর দৃশ্য সৃষ্টি করবার পর নাট্যকারদের দেখিয়ে বলতেন, এই দৃশ্যানুসারে গল্প লিখতে এবং নাট্যকারগণও এই প্রথাকে অনুসরণ করে চলতেন। একই প্রকার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিকে তখনকার দর্শক ও দৃশ্যসজ্জাকর পছন্দ করতেন না। ফলে নতুন নতুন দৃশ্য উদ্ভাবন করা হতো। এই উদ্ভাবনের জন্যে মঞ্চের চতুর্দিকের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যার ফলে নতুন মঞ্চ-পরিকল্পনায় মঞ্চের সর্বদিক যাতে ব্যবহার করা যায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হতো। যেমন মঞ্চবেদীর উপর প্রচুর স্থান রাখবার রীতি, মঞ্চবেদীর নিম্নে, বেদীর ডাইনে-বাঁয়ে ও পেছনে প্রয়োজনীয় স্থান রাখবার রীতি প্রচলিত হয়। পূর্বের মঞ্চে এইসব সুযোগ সুবিধা মোটেই ছিল না, তখন হয়ত এর কোনও প্রয়োজনও হয়নি।

একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, এই ব্যালে অপেরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল কমেডি-ডেল-আর্ট-এর দ্বারা। এর অগ্রগতিকে সাহায্য করে সমসাময়িক সম্প্রদায়, যারা কমেডি-ডেল-আর্ট আন্দোলনে যুক্ত ছিল। এই শিল্প সৃষ্ট হয়েছিল গণশিল্পীয় দ্বারা এবং এর প্রথম লক্ষ্য ছিল অতি সাধারণ মানুষকে আনন্দ দান করা। ব্যাপকতা বেশি থাকার জন্য তৎকালীন মঞ্চের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে একে উপযুক্তভাবে উপস্থাপিত করা যেত না। রাজপ্রাসাদ থেকে ডাক আসবার পর এঁরা কিন্তু থিয়েটার অব দি কিং-এর মঞ্চে তাঁদের শিল্পকে উপস্থাপনা করলেন না। কারণ এ মঞ্চ ছিল আকারে ছোট। তাই তাঁরা বেছে নিলেন রাজার বলরুমকে। যেহেতু এইসব বলরুম আকারে মঞ্চের থেকে বৃহৎ ছিল। বলরুমকে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়া হতো। এর একাংশ দর্শকের এবং অপরাংশ মঞ্চ। দর্শকদের অংশে বসবার চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। দর্শক-আসনের পেছনে একটি উঁচু বেদীতে রাজধানী ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ বসত। মঞ্চবেদী বলে কিছু ছিল না বললেই হয়। ঘরের মেঝেই ছিল মঞ্চবেদী। তবে সম্ভব হলে একে একটু ঢালু করা হতো দর্শকের দিকে।

কোর্টের হলঘরে ব্যালে অপেরা। হল ঘরের পেছনের দিকে বিভিন্ন দৃশ্য সম্বলিত একটি পেজেন্ট রয়েছে।

প্রথমাবস্থায় ব্যালে-অপেরার দৃশ্যসজ্জা বলতে ডেকর-সিম্বলটানেকে অনুসরণ করা হতো। পরে অবশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরের প্রথম দিকে দেখা যায় যে, কতকগুলি জীবন্ত ছোট ছোট গাছ রাখা হয়েছে,—অর্থাৎ বনের দৃশ্য। আবার কোথাও দেবপুরীর অথবা পাহাড়-পর্বতের কাট-আউট। অভিনেতারা এর ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা করত। মঞ্চের পেছনের দেওয়ালে একটি অঙ্কিত পর্দা থাকত। প্রয়োজনে একটি উঁচু বেদী এর সামনে স্থাপন করা হতো। কখনও উপর থেকে ঝাড়-লণ্ঠন, কখনও বা ওইসব গাছে ফুল লাগিয়ে দৃশ্যের চাকচিক্য বাড়ানো হতো।

নবজাগরণের প্রথম থেকে অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে, অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রূপ নেয় আজকের মঞ্চ। এই ইতিহাসের মধ্যে বিরাজ করছে জানা অজানা অনেক চিন্তা-চেতনা, বহুমুখি প্রতিভার সমন্বয়, শিল্পী-নাট্যকার-পরিচালক-শিল্পনির্দেশক ও কলাকুশলীদের সম্মিলিত অকৃত্রিম প্রচেষ্টা, তবেই-তো আজকের মঞ্চ একটা স্থিতিশীল রূপ নিয়েছে।

স্বদেশ : দুষ্টক্লাইভ, বন্ধুক্লাইভ

ক্লাইভের দলবল বুঝেছিল যে, সতত অস্ত্র-আস্ফালনের মধ্য দিয়ে দেশের লোকের হৃদয় জয় করা সম্ভব নয়। একটা আধুনিক সমাজ থেকে এসে অবিরাম অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে তাদেরও আর ভাল লাগছিল না; সাংস্কৃতিক মনের চাহিদা মেটাতে চাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,—চাই সঙ্গীত-নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠান। এদেরই কতিপয়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হতে শুরু হল নানান ঘরোয়া অনুষ্ঠান, ঘরোয়া অনুষ্ঠান থেকে ক্লাব-অনুষ্ঠান; ক্রমে এই মানসিকতার মধ্য দিয়েই জন্ম নিল চৌরঙ্গি ও সাঁ সুসি থিয়েটার।

এদের এইসব অনুষ্ঠান দেখে বঙ্গসন্তানদের মনেও উদ্দীপনা সৃষ্টি হল। তারা এই উদ্দীপনার ফলে বেশিদিন আর সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকতে নারাজ। নিজেরা কিছু করবার তাগিদ অনুভব করল।

পলাশির পর প্রায় সত্তর বছর ধরে চলেছিল এই সার্বিক প্রস্তুতি। তারই আশু ফল দেখা গেল ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারিকেলডাঙার বাগান বাড়িতে। প্রতিষ্ঠিত হল—হিন্দু থিয়েটার। ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালিদের দ্বারা ইউরোপীয় ভাবধারায় নাট্যানুষ্ঠান করবার প্রথম প্রচেষ্টা। ১৮৩১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ'-এ দেখতে পাওয়া যায়: 'ঐ নতনশালা ইংগলণ্ডীয়দের রীতানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকল ইংগলণ্ডীয় ভাষায়।' ১৮৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর এই মঞ্চের প্রথম অভিনীত নাটক সেক্সপীয়রের "জুলিয়াস সিজার" নাটকের অংশবিশেষ ও উলসন কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির "উত্তররাম চরিত"। অভিনয়ের দিনে উপস্থিত ছিলেন—স্যার এডোয়ার্ড রায়ান, কর্নেল

ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ। ক্লাইভের সেতুবন্ধন এখানেই সার্থক হল। প্রথমত, নব্য-শিক্ষিত কৃতী বঙ্গসন্তানগণ ইউরোপীয় মঞ্চের ভাবধারায় ইংরেজি নাটক করলেন; দ্বিতীয়ত, বণিকবেশী ইংরেজগণ এদেশের ভাষা শিখে এদেশের দর্শন, সাহিত্য ও নাটক অনূদিত করে বিশ্বজনের দরবারে উপস্থিত করলেন। এইরকম ইংরেজিতে অনূদিত একটি নাটক 'উত্তররামচরিত' এখানে অভিনীত হল। যদিও হিন্দু থিয়েটারের আকর্ষণ সর্বজনীন ছিল না, কারণ এখানে সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না এবং সেই সঙ্গে অভিনীত নাটকগুলি দেশীয় ভাষায় না হয়ে ইংরেজিতে হয়েছিল।

সেই কারণে বোধহয় বঙ্গজননীর অভিমান ও আক্ষেপের শেষ ছিল না, তিনি তাঁর সুকন্যাকে পাঠালেন দরবার করতে। সুকন্যা তার অন্তরের অকৃত্রিম ব্যাকুলতা-আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে গেয়ে চলেছে, 'আমার হাত ধরে—তুমি নিয়ে চলো সখা···।' এ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় আবিষ্ট হয়ে ব্রিটিশকন্যা তার অন্তরের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে গাইতে শুরু করল, 'মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার···।' অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে কে যেন মৃদু-কণ্ঠে বলল, 'নিজের করে নে, নিজের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দে, মায়ের কণ্ঠের ভাষায় মেলা'—ভেসে এল সুললিত বীণার ঝঙ্কারে, 'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,··· যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!··· মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥' সচকিত হয়ে উঠল বঙ্গসংস্কৃতির সুসন্তানদল। প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৩২-৩৩ সালে শ্যামবাজারের শ্রীনবীনচন্দ্র বসুর উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়ের জন্য একটি রঙ্গালয়। এই মঞ্চে যেমন বাঙলায় নাটক অভিনীত হতো সেই সঙ্গে এখানে নাটকের মহিলা চরিত্রে মহিলারা[১] অভিনয় করতেন। ১৯৩৫ সালের ৬ অক্টোবর এই মঞ্চে "বিদ্যাসুন্দর" নাট্যাকারে অভিনীত হয়। তৎকালীন "হিন্দু-পাইয়োনিয়ার" নামে ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকায় সবিস্তারে এই অভিনয়ের প্রতিবেদন পাওয়া যায়। পত্রিকার মন্তব্যানুসারে—যদিও বাংলায় অভিনীত নাটক কিন্তু প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মঞ্চ-প্রথাকে অনুসরণ করা হয়েছে। এই নাটকে যে সব অঙ্কিত দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে তা মোটেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। পারস্পেকটিভ রীতিতে অঙ্কিত দৃশ্যগুলি ছিল অপরিমিত। চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞানের অভাব বেশ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

পলাশির প্রান্তরে যে নয়া-ইতিহাসের পত্তন হয়েছিল, হয়েছিল সাতসমুদ্র তেরোনদীর পেরিয়ে যে সেতুবন্ধন,—এই দুই মঞ্চ সেই বন্ধনের প্রথম ও ঐতিহাসিক রূপরেখা।

এরপর বঙ্গসংস্কৃতি সুকন্যা কত সুরে কত ব্যঞ্জনায় কত সাজে মাতিয়ে তুলল সকলকে। কখনও সে পাশ্চাত্য পোশাকে পিয়ানোর তালে তালে, কখনও সে ঘাঘরা আর সালোয়ার

১. এই রঙ্গালয়ের পূর্বেও মহিলাদের অভিনয় করতে দেখা যায় যাত্রামঞ্চে। ১৮৪৯ সালের মার্চমাসে জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীরামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নন্দবিদায়-যাত্রা অভিনীত হয়। এই যাত্রা-পালায় মেয়েদের প্রথম আসরে নামতে দেখা যায়।

পরে সারেঙ্গির বিলম্বিত লয়ে ঘুঙুরের রুনুঝুনুর মধ্য দিয়ে বা উত্তেজিত জাহানারার দীপ্ত ভাষণে, কখনও বা নিয়তি বা দেবদাসীর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, কখনও বা লেডি ম্যাকবেথ হয়ে সমগ্র রঙ্গভূমিকে বিমোহিত করে তুলল। এইভাবে সে ছুটে বেড়াতে লাগল স্থান হতে স্থানান্তরে। স্থায়িত্বলাভ করতে পারছে না। ফলে এই অস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে সে সম্পূর্ণ বিকশিত হতেও পারছে না।

চৌরঙ্গি ও সাঁ সুসি থিয়েটার থেকে যে আলোর বিচ্ছুরণ হয়েছিল, তাতেই আলোকিত হিন্দু থিয়েটার ও শ্রীনবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটার। এই দুটি থিয়েটার যে উৎসাহ ও আবেগ সৃষ্টি করেছিল তারই এক প্রকাশ শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। এই সময় এই সব উদ্যোগের প্রভাব কলকাতার আশেপাশে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে দুটি অভিনয়-রজনীর খবর পাওয়া যায়, তার প্রথম নাটক "বেণীসংহার" ১৮৫৭ সালের ১১ এপ্রিল মঞ্চস্থ হয় এবং দ্বিতীয় নাটক "বিক্রমোর্বশী" ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর অভিনীত হয়। এই সব অভিনয় যাঁরা দেখতে আসেন "হিন্দুপেট্রিয়ট"-এর [১৮৫৭ সালের ৩ ডিসেম্বর] মতে,—'বুদ্ধি, সুরুচি, বিজ্ঞতা, বিলাস ও সম্ভ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের দেশীয় সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই মহার্ঘ শীতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নাট্যশালার আয়তনের অনুপাতে বেশী হইয়াছিল। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত শুনিলাম, দর্শকের ভিড়ের জন্য চৌরঙ্গীর অভিজাতবর্গের মধ্যে অনেকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' পরিশেষে "হিন্দুপেট্রিয়ট" এই বলে তার বক্তব্য শেষ করেছে—'এইরূপ একটি নাট্যশালা চিরস্থায়ী হওয়া উচিৎ।'

"হিন্দুপেট্রিয়ট"-এর বক্তব্যের মধ্যে দুটি ছবি খুব পরিষ্কার বেরিয়েছে। তখনকার দিনে নাটক দেখবার আগ্রহ ও উৎসাহ কলকাতাবাসীদের প্রচুর পরিমানে ছিল এবং সেই সঙ্গে এই উদ্দীপনার জন্য যে স্থায়ী মঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন, সেই দিকটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এতদিন ধরে যে সব নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া গেল, তাদের স্থায়িত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ধনীব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলি পরিচালিত হলেও তাকে ধরে রাখা যায়নি। অর্থের টান পড়লেই এই সব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিয়েও টানাটানি শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন চেহারা না থাকলে একজন বা পরিবারের কতিপয় অতি উৎসাহী যোগ্যলোকের দ্বারা পরিচালিত হলেও তার বৃহৎ খরচখরচা চালিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর। তাই এদের অবলুপ্তি ঘটেছে নীরবে ও নিভৃতে। এইসব ঘটনা সর্বজন বিদিত তবুও নাট্যক্রীড়াতে এমনই এক অমোঘ আকর্ষণ আছে যা সর্বসময়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষকে টানে, শত দুঃখ ব্যথার মধ্যেও মানুষ উৎসাহিত হয় এবং এই শিল্পকে উপস্থাপিত করতে আপ্রাণ লড়ে যায়! এ শিল্প চিরন্তন গতিশীল, এর আদি-অন্তের মূল মানুষের মনের গহ্বরে নাড়া দিয়ে মানুষকে আকর্ষিত করে, এগিয়ে নিয়ে

যায় আগ্রহের সঙ্গে। আরও পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা জোগায়। এ শিল্পের নিত্য-নতুন সৃষ্টির আকুতি এবং তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে সতত অকৃপণ প্রচেষ্টা চলেছে বিশ্বময়। অন্যান্য শিল্পে প্রকাশ সহজ হলেও তার ভাষা সৃষ্টি করা খুবই কঠিন। তুলি-রঙ-কাগজ নিয়ে একটি গাছ আঁকা সহজ কিন্তু তাতে শিল্পের ভাষা সৃষ্টি করা কঠিন। আর ভাষা না থাকলে সে তো নিছক একটি গাছের অঙ্কিত অনুরূপ, শিল্পের মর্যাদা কোথায়? তা কাউকেই আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু যদি দেখা যায় গাছটি হাওয়ায় হিল্লোলিত বা ঝড়ের গতির সঙ্গে প্রবাহিত, তার প্রতিটি শাখায়-প্রশাখায়, পল্লবে ফুটে উঠেছে ঝড়ের ভয়ঙ্কর রূপ তবেই সে সার্থক, তার শৈল্পিক চরিত্র ও ভাষা প্রকাশিত ;—তখন সে শিল্প মর্যাদা পাবে, আলোড়িত করবে শিল্পরসিকের মনকে। সেক্ষেত্রে নাট্যশিল্পের ব্যাপারটা একটু পৃথক, কারণ নাটকে একটা আটপৌরে ভাষা থাকে কিন্তু শিল্প থাকে না। শিল্প সৃষ্টি করতে হয়। সেখানে রঙ-আলো-শব্দ-পোশাক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বাহিক ও আঙ্গিক অভিনয়—সব মিলিয়ে শিল্পের সৃষ্টি হয়, শিল্পের ভাষা তৈরি হয়। কোনও কিছুর অপরিমিত ব্যবহারে শিল্পরসের ব্যাঘাত ঘটে, বিচ্যুত হয় ধ্রুপদী শিল্প সত্তা হতে।

পূর্বসূরীদের এই সব নাট্যপ্রচেষ্টা ক্রমে নাট্যশিল্পকে পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তাঁদের আত্মত্যাগ, জিগীষা, চিন্তা চেতনার প্রক্রিয়া প্রতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেছে,—তারই একটি প্রকাশ বেলগাছিয়ার নাট্যশালা। এই নাট্যশালা সম্পর্কে মধুসূদন বলেছেন, 'যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুইজন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না,—ইঁহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।'

মধুসূদনের কথা যে কত সত্য তা "রত্নাবলী" নাটকের নানান প্রতিবেদন থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই নাটকের অভিনয়ের পর উপস্থিত দর্শক সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কি অভিনয়ে, কি দৃশ্যসজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি পোশাকে সর্বাঙ্গসুন্দর নাট্যাভিনয় এর আগে দেখা যায়নি। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে বেলগাছিয়ায় তাঁদের বাগানবাড়িতে এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়! এই মঞ্চগৃহটির পরিকল্পনায় ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই মহান মঞ্চের কোনও রূপরেখা (Ground Plan) আমাদের সন্ধানে নেই। যা আছে তা হল তৎকালীন কিছু পত্রিকা ও যশস্বী লোকের নিজস্ব বক্তব্য। এর থেকে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, "রত্নাবলী"র উপস্থাপনা পূর্ব উপস্থাপনা থেকে অনেক উন্নত ও যুক্তিযুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, নাটকের সর্বশাখায় সমযত্নবান হওয়ার ফলে নাটকটি সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। নাটকের পোশাক ও দৃশ্যপট যে যথেষ্ট সুন্দর হয়েছিল সে কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, তার ন্যূনতম নিদর্শন বা বিশদ বর্ণনা আমাদের সামনে নেই। শুরু থেকে এ

পর্যন্ত একটা ব্যাপারে সকলেই নীরব,—তা হল আলো। অর্থাৎ সেই সময় মঞ্চ-আলোকিত করতে কী প্রকার আলোর ব্যবস্থা ছিল। বা, দৃশ্যের ভাবানুসারে তার অবস্থার কোনও পরিবর্তন করা হতো কিনা, তা জানা যায় না। এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছি। তৎকালীন প্রচলিত আলোর ব্যবহার নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু কখন কী অবস্থায় তার ব্যবহার হতো বা একই অবস্থানের মধ্যে পুরো নাটক অভিনীত হতো কি-না তা স্পষ্ট নয়। তবে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে হয়ত মনে করা যায় যে অবস্থানের কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না করেই নাটকটি অভিনীত হতো।

শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী" অবলম্বনে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটকটি বাংলায় লেখেন। নাটকটির প্রথম অভিনয় রজনী ১৮৫৮ সালের ৩১ জুলাই, শনিবার। রাত সাড়ে আটটায় অভিনয় শুরু হয় এবং শেষ হতে প্রায় ছয়ঘণ্টা সময় লাগে। এই নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয়-সাত বার অভিনীত হয়।

এই নাটকটির উপস্থাপনায় তৎকালীন বঙ্গসমাজের যাঁরা শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক-কবি প্রমুখ দিকপাল সকলেই সমবেত হয়েছিলেন। এই কারণে "রত্নাবলী" নাটকটি বঙ্গনাট্য ইতিহাসে একটি বিশেষ দিকচিহ্ন হিসাবে বিরাজ করছে। দর্শকগৃহে উপস্থিত ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন, মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, বাংলাদেশের গভর্নর স্যার হ্যালিডে, হিউম, ডাক্তার গুডইব চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

রত্নাবলী নাটক বিদেশিদের বোধগম্যের জন্য মধুসূদন কর্তৃক ইংরেজিতে অনুবাদ করে পূর্বেই বিলি করা হয়েছিল। এই অনুবাদ করা এবং রত্নাবলীর অভিনয় মধুসূদনের জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই অনুবাদের মধ্যে যেমন তাঁর কবিমানসের বিকাশ ঘটেছিল সেই সঙ্গে তাঁকে নতুন আঙ্গিকে নাটক লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল—তারই আশুফল "শর্মিষ্ঠা" নাটক। "রত্নাবলী"র অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়েই আমরা বাংলা সাহিত্যের এক মহাকবি ও নাট্যকারকে পেয়েছিলাম।

"শর্মিষ্ঠা" নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় ১৮৫৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। নাটকটি ওই নাট্যগৃহে ছয়বার উপস্থাপিত হয় এবং শেষ অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর।

তৎকালীন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই নাটক দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং সকলেই একবাক্যে মধুসূদনকে উৎসাহিত করেছিলেন। এ নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদন নিজেই বলেছিলেন, 'things to dream, not to tell.'

বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধেও এই কথাটি প্রযোজ্য—'Things to dream, not to tell', কারণ এই সময়ে নাট্যপিপাসু রসিকজনের মনে মঞ্চটি যেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা 'not to tell'-এর মতো। তখন বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতায় নাটক-করা নিয়ে এক মহোৎসব শুরু হয়ে যায়। এইসব দেখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মধুসূদনকে লেখেন : 'এক্ষণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয় এগুলি স্থায়ী হয় না। তবু এগুলি সুলক্ষণ বলিয়াই গণ্য করা উচিৎ ; কারণ, ইহাদের দ্বারা বুঝা যায় যে আমাদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে রুচির প্রসার হইতেছে।' এর থেকে বোঝা যায় যে, স্থায়ী মঞ্চের জন্য মানুষ বেশ উদগ্রীব, উৎসাহী ও আক্ষেপের মধ্যে আছে। এইটেই বোধ হয় বেলগাছিয়া নাট্যশালার সবচেয়ে বড় অবদান এবং স্মরণীয় কীর্তি। ১৮৫৯ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর এই মঞ্চগৃহে শেষ অভিনয় হয়।

ইউরোপের কোর্টথিয়েটারের যে চরিত্র ছিল এ দেশেও ওই একই প্রকৃতির নাট্যাভিনয় হতে আরম্ভ করল রাজা ও ধনীগৃহের আবেষ্টনীর মধ্যে। আসলে সামন্তদের মধ্যে এ এক অলিখিত প্রতিযোগিতা,—মর্যাদার লড়াই। নিজেদের 'আমি কি কমতি আছি'—মার্কা গরিমা পরস্পরের মধ্যে দেখাতে না পারলে সমাজে আসন পাওয়া যায় না,—এই চিন্তা থেকেই এ-সকল নাট্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত। এতে উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু লাভ হয়েছে মঞ্চশিল্পের, নাটকের, সঙ্গীতের অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সব শাখার। প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঘটেছে নাটক উপস্থাপনার অগ্রগতি। কারণ যাঁরা এই সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই শিক্ষিত, জ্ঞানী, পণ্ডিত এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজের এক-একজন দিকপাল। এঁদের নিকট বঙ্গনাট্যশিল্প সর্বতোভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সমাজে বিধবাবিবাহ নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ বয়ে চলেছে। এই আন্দোলনের পক্ষে যেমন সমর্থন ছিল আবার বিরোধিতাও ছিল। নাটকের ধর্ম—সে সমসাময়িক ঘটনাকে আশ্রয় করে তার দর্পণের মাধ্যমে চিন্তা চেতনাকে জনমানসে পৌঁছে দেয়। এতদিন নাটকের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, আজ তার পরিবর্তন শুরু হল। লেখা হল বিধবাবিবাহ নিয়ে বেশ কিছু নাটক। এই ধারার সূত্রপাত হয় ১৮৫৬ সাল থেকে। এই ধারা সাবলীল গতিতে প্রবাহিত না হলেও এর বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।

১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "শর্মিষ্ঠা" নাটকের শেষ অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর সমাজসংস্কারমূলক বিষয়—বিধবা-বিবাহ নিয়ে কিছু নাটকের অভিনয়ের সংবাদ ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের কথা জানা যায় না। নাট্যানুষ্ঠানের গতির প্রাবল্য অনেক প্রশমিত হয় এবং বেশ কিছু-দিন বন্ধও থাকে। যদিও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদিবাড়িতে ১৮৫৯ সালে এবং ১৮৬০ সালের ৭ জুলাই "মালবকাগ্নিমিত্র"-নাটকের দুইবার অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার গৌরবজনক অধ্যায় শুরু হয় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। "বিদ্যাসুন্দর"-এর অশ্লীল ইঙ্গিত সব বাদ দিয়ে,—"বিদ্যাসুন্দর" ও একটি প্রহসন,—"যেমন কর্ম তেমনি ফল" নাটক দুটির প্রথম

অভিনয় হয়। এই দুটি নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি,—মোট অভিনয়ের সংখ্যা আট-নয় বার। এরপর ১৮৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর "বুঝলে কিনা" নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। ১৮৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি রামনারায়ণ তর্করত্নের "মালতীমাধব" নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই নাটকটি দশ-এগারো বার অভিনীত হয়। ১৮৭০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের সঙ্গে দুটি প্রহসন,—"চক্ষুদান" ও "উভয় সঙ্কট" অভিনীত হয়। এরপর বেশ কিছুদিন নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ থাকে। শেষে ১৮৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি ও ৫ মার্চ "রুক্মিণী-হরণ" ও "উভয় সঙ্কট" সর্বসুদ্ধ দশ-এগারো বার অভিনীত হয়। "রুক্মিনীহরণ" ও "উভয় সঙ্কট"-এর শেষ অভিনয় হয় ১৮৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি।

এই প্রথম দীর্ঘ নয় বছর একটি রঙ্গালয়ের স্থায়িত্বের খবর পাওয়া গেল। যদিও ধারাবাহিক কোনও অনুষ্ঠান এখানে হয়নি তবুও সুযোগমতো নাট্যানুষ্ঠান হয়েছে যা সাংস্কৃতিক আবহাওয়াকে বজায় রেখেছে, করেছে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত। যা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রাথমিক সূচনার উন্মেষ হিসাবে কাজ করেছে। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালা বাংলা স্থায়ী ও পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের প্রচ্ছদপট। এত দীর্ঘদিন কোনও মঞ্চের অস্তিত্ব টিকে থাকেনি, সেইজন্য ইতিহাসে এর একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে।

সাধারণ নাট্যশালার ভিতস্থাপনের মূলে পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা [১৮৫৮-১৮৫৯] এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে—পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার [১৮৬৫-১৮৭৩] ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই মঞ্চ-পরিচালকদের যদি উপস্থাপিত নাট্যক্রীড়ায় উৎসাহ, সহযোগিতা ও একনিষ্ঠ অংশগ্রহণ না থাকত তবে বোধহয় সাধারণ মঞ্চের ইতিহাসের জন্যে আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতো। সেইজন্য এই দুই মঞ্চের কর্মকাণ্ড সর্বকালে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার যোগ্য।

নাট্যানুষ্ঠান যখন চারিদিকে হইচই সৃষ্টি করেছে তখন শোভাবাজার রাজবাড়ি নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকে কী করে? অচিরেই শুরু হল মহড়া। শেষে ১৮৬৫ সালের ১৮ জুলাই মঞ্চস্থ হল,—"একেই কি বলে সভ্যতা"। নাট্যকার—মধুসূদন দত্ত, স্থান—শোভাবাজার নাট্যশালা। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার মধ্যদিয়ে নাট্য—পরিচালকদের প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে। তখনকার নগরসভ্যতার মধ্যে নিজেদের যারা অত্যাধুনিক মনে করে যথেচ্ছ আচার-ব্যবহার করত, তাদের মুখোশ খুলে, নগ্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে…। এইসব 'ইয়ংবেঙ্গল'রা সমাজকে বিকৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল; মধুসূদন এদের নির্মমভাবে কশাঘাত করেছেন। এই নাটকিট ১৮৬৫ সালে ২৯ জুলাই দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের পর অনেকদিন এই মঞ্চে কোনও অভিনয় হয়নি। শেষে ১৮৬৭ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী"—নাটকটি সাড়ম্বরে একবার অভিনীত হয়।

মঞ্চ, অভিনয় ও আনুষঙ্গিক সর্ববিষয়ে যখন অগ্রগতি অব্যাহত তখন নাটকের বিষয়বস্তুও পুরনো চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তারও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। পুরনো

চিন্তায় আবদ্ধ না থেকে সমসাময়িক সমস্যা ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রধান দায়িত্ব। ইংরেজি-শিক্ষা বঙ্গাদিকপালদের এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এখানেই ক্লাইভ সার্থক ; দুষ্ট ক্লাইভ এখানেই বন্ধু ক্লাইভ-এ পরিণত হল।

১৮৫৬ সাল থেকে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাল্যবিধবাবিবাহ নিয়ে এক আন্দোলন শুরু হয়। এইসব বাল্যবিধবাদের নিয়ে সমাজে যে ট্রাজেডি, নষ্টামি ও সামাজিক চক্রম বিপর্যয় ঘটত,—তা শুধু অশ্রুপাত, ক্রোধ ও ঘৃণায় মনকে ক্ষতবিক্ষত করত। এদের জীবনের মূল্যবোধকে অবজ্ঞায়, অনাদরে, অবহেলায় তুচ্ছজ্ঞান করা হতো, কিন্তু এদের নিয়ে ভোগবিলাসের ও ব্যাভিচারের অন্ত ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল ব্রিটিশজমানার সামন্তপ্রভু অর্থাৎ জমিদারশ্রেণীর চরম অত্যাচার। এদের নিষ্ঠুরতম আচার-ব্যবহারে মানুষ অতিষ্ঠ হতো। সমাজের কোনও স্তরই এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত না। সমাজকে এগিয়ে দেবার পরিবর্তে তাকে পিছটানে অবনমিত করত। ব্রিটিশ প্রভুদের প্রশ্রয়ে এইসব জমিদাররা ছিল বলীয়ান ও প্রবল প্রতিপত্তিশালী। সচেতন ঠাকুরপরিবারের প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা এই দুটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এই দুটি বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলে সমাজের কল্যাণ সম্ভব নয়। তাঁদের রণকৌশলে সমবেত করলেন তৎকালীন গণমান্য পণ্ডিত সেনাপতিদের। এই দুটি বিষয়ের উপর লোকশিক্ষার অনুকূলে উৎকৃষ্ট বাংলা নাটক না পেয়ে ১৮১৫ সালের ১৫ জুলাই—"ইণ্ডিয়ান মিরার" নামে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলেন :

'ADVERTISEMENTS

The following Prizes are offered by the Committee of the Jorasanko Theatre for the best dramatic Productions on the following Subjects :

No. 1 — Rs. 200

The Hindoo Females,—their Condition and Helplessness. To be handed over to the Committee before the 1st of June, 1866.

No. 2 — Rs. 100

The Village Zemindars.

Period —Before the 1st of February, 1866.

The dramas are to be written in Bengali, and must be dedicated to the Jorasanko Theatre.'

পরে অবশ্য কর্মকর্তারা এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নাটক লেখার দায়িত্ব পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর দেন।

এই বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু থেকে জোড়াসাঁকো থিয়েটারের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁরা বঙ্গসমাজের অনাচার-কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার মূলে কঠোর আঘাত হানবার জন্য উদ্যত হাতিয়ার-সহ অগ্রসর হয়েছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু নিষ্ঠুর সামন্ত-

তন্ত্রকে বিনাশ করবার ষড়যন্ত্রে অস্ত্রে শান দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এইখানেই জোড়াসাঁকো থিয়েটারের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

অচিরেই পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন "নবনাটক" নামে একটি নাটক লিখে জোড়াসাঁকো থিয়েটারকে উপহার দেন। নাটক পাবার পর থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ বেশ ঘটা করে মহড়া শুরু করলেন। সেইসঙ্গে চলল আনুষঙ্গিক—মঞ্চ-দৃশ্য-আলো-পোশাক ইত্যাদির প্রস্তুতি। এই প্রথম মঞ্চ-দৃশ্য-আলো সম্পর্কে অল্প-বিস্তর খবর পাওয়া গেল। এর পূর্বে—'মনোহর দৃশ্য অঙ্কিত করা হইয়াছে'—এর বেশি খবর পাওয়া যায়নি। এই নাটক সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে দৃশ্যের চরিত্র ধরা পড়ল। তিনি লিখেছেন : 'দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ [Scene] আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ জগমন্দির প্রাসাদ অঙ্কিত হইল।··· দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।'

এই সময়ে নব-নাটকের একটি অভিনয় দেখে তখনকার সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' ২৮ জানুয়ারি, ১৮৬৭-তে মঞ্চ ও দৃশ্য সম্পর্কে লিখেছিল : 'নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি—মনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই, এ সমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত।' এই প্রথম একটি পত্রিকার বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, মঞ্চে আলোর ব্যবস্থা খুব সুসংযত হয়েছিল এবং যে ভাবেই হোক আলো কমবেশি করবার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছিল, নইলে— 'সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময়—অতিমনোহর'—কথাটির উল্লেখ করত না। দ্বিতীয়ত, মনে প্রশ্ন জাগে হয়তবা রঙিন কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছিল, নইলে সূর্যাস্তের আলোর রঙ ও জ্যোতি এবং সন্ধ্যার আলোআঁধারের আবেশ সৃষ্টি হল কী প্রকারে?

ঠাকুরবাড়িতে নব-নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি এবং উপর্যুপরি নয়বার এই নাটকটি অভিনয় হয়। শেষে ওই একই বছরে মঞ্চটির কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটে। এই নাটকের দর্শক হিসাবে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন একজনকে পাই, যাঁকে নাট্য দুনিয়ায় আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তিনি ছিলেন বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম সারির যোদ্ধা—শ্রদ্ধেয় অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য, অনাহার, সামাজিক অশ্রদ্ধা এসব মাথায় করে আজকের মঞ্চকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করে গেছেন এঁরা।

১৮৬৭ সালের পর নানান ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নাট্যানুষ্ঠানের ক্রমসমৃদ্ধি হতে থাকে। বাঙালি নাট্যপ্রিয় জাত, তাই হাটে-মাঠে-ঘাটে যখনই বাঙালি সুযোগ পেয়েছে তখনই

দু-একটা মঞ্চাভিনয়ের উৎসাহ দেখিয়েছে। লোকে বলে—বাঙালি যেখানেই যায় সেখানে একটি কালীমন্দির ও একটি নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা গৌরবের কথা। নাট্যশিল্পকে কত গভীরভাবে ভালবাসলে বা শ্রদ্ধা করলে তবে একটি নাটমন্দির ও অভিনয়ের দল গঠন করা সম্ভব। এই ভাবেই ইতিহাসের গতি বয়ে চলেছিল। কিন্তু ১৮৬৭ সালের ২ নভেম্বর 'কিছু কিছু বুঝি' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের কথা উল্লেখ না করলে দুজন বিশেষ ব্যক্তির জীবনের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা জানতে পারা যাবে না, প্রথমজন সর্বজনবিদিত অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও দ্বিতীয়জন বিখ্যাত শিল্পনির্দেশক ধর্মদাস সুর। এই নাটকের মধ্য দিয়ে তাঁদের কর্মজীবনের সুরু। এই নাটকে অভিনয়ের জন্য পরিজনদের নিকট থেকে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল এমনকি তিনি আশ্রয়চ্যুত হয়েছিলেন। 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটার বাড়িতে। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৭ সালের ২০ নভেম্বর।

এইভাবে নাট্যোৎসবের মধ্য দিয়ে বাঙালি সত্তর দশকে পৌঁছে যায়। এই উৎসবে অবশ্য সমগ্র বাংলাদেশ যোগদান করেছিল। ঢাকা, বরিশাল, যশোর, খুলনা, চব্বিশ পরগনা ও অন্যান্য স্থানও এই উৎসবে সমবেত হয়ে বাংলা নাট্যোৎসবকে মুখরিত করেছিল। যেহেতু এগুলি ছিল—কে কত ভাল করতে পারে—তার প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপার তাই নাট্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। কারণ দেশ-কাল-সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার মিশ্রণের মধ্যে তার বিকাশ ঘটেছিল।

বাংলা নাটক করবার উদ্দীপনা ও উৎসাহের মূলে যিনি, প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন যিনি, সেই নবীনচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জয়মাল্য না পরিয়ে উপায় নেই। ১৮৩৫ সালের ৬ অক্টোবর তিনি বাগবাজার 'বিদ্যাসুন্দর'কে নাট্যাকারে অভিনয় করান। যদিও গোড়াতে সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত বাংলা নাটকের ভিতপ্রস্তর স্থাপন করেন মধুসূদন তাঁর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা, ; পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের নব-নাটক ; দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', 'নীলদর্পন' এবং আরও অনেক নাট্যকারেরা, এই ধরনের সমাজ-সংস্কারমূলক নাটকের মধ্য দিয়ে। সমাজের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করে মানুষকে সজাগ করে তুলেছিলেন তাঁরা। তাঁদের তৈরি পতাকা হাতে করে বাংলা নাট্যশিল্পীর দল এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন ধারায় আরও উন্নততর শিল্পের সন্ধানে।[১]□

১. বন্ধু ক্লাইভের হাত ধরে শুরু হলেও বাংলা নাটক এর পরে অনেকেই বদলেছে। সেই বদলের ও নানা টানা পোড়েনের ইতিহাস এখানে অনুচ্চারিত রইল। সাধারণ রঙ্গালয়, মঞ্চ-কলাকৌশল, আলো প্রভৃতি সম্পর্কেও অনেক কথাই বলার আছে। কখনও সুযোগ হলে সে সব নিয়ে সবিস্তারে বলা যাবে। যোগসূত্রের নাটক বিষয়ক সংখ্যায় এই রচনাটির উদ্দেশ্য মঞ্চ সংক্রান্ত ইতিহাসের একটি অধ্যায় তুলে ধরা মাত্র।—লেখক